হারাম শরীফের দেশ ফজিলত ও আহকাম

(বাংলা)

البلد الحرام فضائل وأحكام

((باللغة البنغالية))

إعداد: كلية الدعوة وأصول الدين

جامعة أم القرى

প্রণয়নে

দা'ওয়াহ ও উসূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়া, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

2011 - 1432

IslamHouse.com

অনুবাদ

ড. হিজবুল্লাহ, ড. হাসান মুঈনুদ্দীন
ড. কুতুবুল ইসলাম, ড. মানজুরে ইলাহী

ترجمة: أ. د. حزب الله، د. حسن معين الدين
د. قطب الإسلام، د. منظور إلهي

সম্পাদনা

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

مراجعة: الأستاذ/ محمد نور الإسلام شاند مياه

সম্পাদকের কথা

আল-হামদু লিল্লাহ। অতঃপর দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর।

আল্লাহ (ﷻ) যে জমিনকে বাছাই করেছেন কা'বা নির্মাণের জন্য। যেখানে আগমন ঘটিয়েছেন লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বরের। পিতা আদম ('আলাইহিস সালাম) থেকে নিয়ে আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসূলের স্মৃতি বিজড়িত যে ভূমি, যেখানে হজের মিলন মেলায় ছুটে আসে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুসলমান, যে দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করে সারা জাহানের তাওহীদ জনতা, এক রাকাত'আত সালাতে যেখানে লক্ষ রাকাত'আতের প্রতিদান, সে পবিত্র ভূমির আরও কত কী ফজিলত! সেখানে মুসলমানদের বসবাসের আদব ও করণীয় কী এ বিষয়েই প্রণীত হয়েছে এ মূল্যবান গ্রন্থটি।

পবিত্র ভূমি মক্কা মুকাররামার উম্মুলকুরা ইউনিভার্সিটির দাওয়া ফ্যাকাল্টির শরিয়া বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও পিএইচ.ডি ডিগ্রীধারী ঊলামায়ে কেরাম বিশুদ্ধ দলিল প্রমাণাদির ভিত্তিতে গবেষণালব্ধ এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। এটিকে বঙ্গানুবাদ করেছেন বাংলাদেশের ৪জন শীর্ষস্থানীয় আলেম যাঁরা এদেশে কামিল বা দাওরা ডিগ্রির সাথে আরব দেশেও উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন। অতঃপর তারা শরিয়া বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি নিয়ে বিভিন্ন ইউনিভারসিটিতে অধ্যাপনা করছেন। গ্রন্থকারদের সংগৃহীত অমূল্য তথ্য এবং অনুবাদকদের নিখুঁত অনুবাদ বইটিকে একটি মূল্যবান সম্পদে পরিণত করেছে বলে আশা করি। তাঁদের সকলকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

বইটিকে সম্পাদনা, সংশোধন ও প্রকাশনার কাজে আমাকে আরও সহযোগিতা করেছেন উম্মুল কুরা ইউনিভারসিটির সাবেক ছাত্র ও বর্তমান নরসিংদীর রায়পুরাস্থ সিরাজ নগর উম্মুলকুরা মাদরাসার শিক্ষক স্নেহের মো: রফিকুল ইসলাম।

মক্কা, মদিনা ও আরব দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিক ও সম্মানিত হাজিগণ হয়তো অনেকেই এ পবিত্র ভূমিতে বসবাসের আদব পুরোপুরি জানেন না। জানেন না হয়তো এখান থেকে ফায়দা হাসিলের সব কথা। তাদের সকলের জন্য বইটি অত্যন্ত উপকারে আসবে বলে আশা করি। আল্লাহ আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন। আমীন!

–মোঃ নূরুল ইসলাম

সূচীপত্র

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমাদের প্রতিপালক যা ইচ্ছে ও পছন্দ করেন তা সৃষ্টি করেন। তার কাছে প্রতিটি জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মনোনীত ও বাছাইকৃত নবীর উপর। তিনি আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ। (রহমত ও শান্তি) বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র ও নেক সাহাবি, তাবে'ঈন ও তাঁদের যারা সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন তাদের উপর। আর এ ধারা অব্যাহত থাকুক যতদিন দিনরাতের পরিক্রমা সচল থাকবে।

মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দা'ওয়াহ ও উসূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি তার মহান দায়িত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল এবং মুসলিম জাতি ও উম্মতকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে অবদান রাখার বিষয়ে তাদের উপর অর্পিত কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। বিশেষ করে আল্লাহ (ﷻ) জ্ঞানের এ সুউচ্চ প্রাসাদ তথা উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এ ফ্যাকাল্টিকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন, যা পৃথিবীর সর্বাধিক সম্মানিত ভূখণ্ড এবং সবচেয়ে বেশি পবিত্র দেশ, রিসালাতের উৎসস্থল, ওহির অবতরণস্থল এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল প্রান্তে হিদায়াত ও আলো বিকিরণের কেন্দ্র। তাই আল্লাহর মেহেরবানিতে এ ফ্যাকাল্টি জাতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে জ্ঞান সমৃদ্ধ দিক নির্দেশনামূলক সিরিজ প্রকাশের মাধ্যমে তার একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বোঝার ক্ষেত্রে মানুষের যে সকল ভুল-ত্রুটি ও অস্বচ্ছ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, এ সিরিজ পুস্তিকাসমূহে কুরআন, সুন্নাহ ও আমাদের

সালাফগণের মতামতের ভিত্তিতে সেগুলোর পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও সংশোধন করা হয়েছে।

এ বছর অর্থাৎ ১৪২৩ হিজরি সালে ফ্যাকাল্টি কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে কয়েকটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা ০৪-০৭-১৪২৩ হিজরি তারিখে প্রেরিত পত্র নং- ৫৬৮৯ এর মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সদয় অনুমোদন লাভ করে। আর এ বরকতময় ফলাফলেরই একটি অংশ হলো এ বই যার শিরোনাম البلد الحرام : فضائل وأحكام (হারাম শরীফের দেশ ফজিলত ও আহকাম)। বইটি সিরিজের দ্বিতীয় বই। এমন স্থানের মর্যাদা যাকে আল্লাহ (ﷻ) ঐ মর্যাদার জন্য নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ তাঁর সম্মানিত শহর এবং তার সর্বোচ্চ সম্মান যে সম্মান আল্লাহ (ﷻ) অন্যান্য শহরকে না দিয়ে একমাত্র এ শহরকে দান করেছেন সেই শহরটিকে (মক্কা) কেন্দ্র করেই বইটির বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে কিছু সংখ্যক মানুষ যারা এ শহরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার হক আদায় করা সত্ত্বেও এ ঘরের মর্যাদা সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান না করায় অথবা এ ঘরের সাথে আল্লাহ (ﷻ) কর্তৃক নির্ধারিত আহকাম সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় অথবা তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থতার কারণে তারা এ সম্মান প্রাপ্ত হয় না। এর ফলে তাদের কাজকর্মে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা এ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা এমন কিছু নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয় যা সরাসরি এ মর্যাদা ও সম্মান বিরোধী। তারা ভুলে যায় যে, এ ঘরের সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর নিদর্শনা বলীকে সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত যা একমাত্র হৃদয়ের তাকওয়া হতেই নিঃসৃত। অতএব এ শহরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী তার তাকওয়া ও সঠিক ঈমানকে প্রমাণ করে। কারণ, এ শহরের সম্মান প্রদর্শন আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন—

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

"এটা আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনা বলীকে সম্মান করলে তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া।"[১]

এদের বিপরীতে অন্য একটি দল রয়েছে বিশেষ করে এ দেশে প্রথমবার যাদের আগমন ঘটে যাদের হৃদয় অন্তর জুড়ে থাকে শওক ও মহব্বত ও মুবারাক ভূখণ্ডে আগমনের এক অনাবিল আনন্দ কিন্তু তারা অপ্রতুল ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী। এদেরকে আমরা দেখতে পাই তারা এমন জিনিসকে সম্মান প্রদর্শন করে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) সম্মানিত করেননি। তারা বড় বড় পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণের প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায় ও এজন্য টাকা খরচ করে- এতে করে তাদের মৃত্যুও তো হতে পারে, প্রাচীন নিদর্শন খুঁজে বেড়ায়, বিভিন্ন গুহা তালাশ করে, কুচি পাথর ও মাটি সংগ্রহ করে, বড় বড় পাথর ছুঁয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। তারা মনে করে এ কাজগুলো বুঝি বালাদে হারাম (সম্মানিত শহর)-কে সম্মান প্রদর্শনেরই অংশ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এজন্য তারা কিছু লেখকও পেয়ে যান যারা এ কাজগুলো পালনে উৎসাহ জোগায়। আর এ সব কিছু করতে গিয়ে ব্যয় হয় প্রচুর মূল্যবান সময়। এ সময়গুলোতে যদি কেউ আল্লাহ (سبحانه وتعالى) যে সব বিষয়কে মর্যাদা দান করেছেন যেমন আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা, মসজিদে হারামে সালাত আদায় করা, কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত করা– এগুলোকে সম্মান প্রদর্শন করতেন তাহলে এটা হতো তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য অনেক বেশি উপকারী এবং শরীর ও মালের জন্য বেশি উপযোগী।

আর এ কারণেই আমরা হারাম শরীফের ফজিলত ও তার বিশেষ বিশেষ আহকাম সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করি। কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দিক নির্দেশনার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ সরল ভাষায় এ শহরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা অতীব জরুরি বলে মনে করি। এতে বিস্তারিত আলোচনা বর্জন করা হয়। বর্জন করা হয় আলিমগণ ছাড়া

---

[১] সূরাহ হাজ্জ ঃ ৩২।

সাধারণ মানুষের প্রয়োজন নেই এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও। আলিমগণের মাঝে বিতর্কিত বিষয়গুলোর মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়গুলোকেই দলিলসহ উপস্থাপন করা হয়।

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী দা'ওয়াহ ওয়া উসূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযুক্ত। তাই ফ্যাকাল্টির এক দল বিশিষ্ট আলিম এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সেগুলোকে সংকলন করেন। পরবর্তীতে তা বইয়ের রূপ লাভ করে। বইটি সম্পূর্ণ করার পর তা সম্পাদনা ও সংশোধনের জন্য অন্য এক দল আলিমের নিকট প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি একদল নেক বান্দা- আল্লাহ (سبحانه وتعالى) তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন- বইটি মুদ্রণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

এভাবে বইটি পরিণত হয়েছে আল্লাহ অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ যাদেরকে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এ শহরে বসবাস, কা'বা শরীফের প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং যাদেরকে এ পবিত্র শহরে আগমনের সুযোগ দান করে মর্যাদাবান করেছেন। আমরা তো আমাদের সাধ্য মত সংশোধন করতে চাই। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমাদের কোন শক্তি নেই। আমরা তো তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।

লেখক-

ড. আবদুল্লাহ ইবনে উমার সুলাইমান আদ-দুমাইজী
ডীন, দাওয়া ওয়া উসূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি
০৮-০৯-১৪২৩ হিজরী
মাক্কাতুল মুকাররামাহ।

ভূমিকা

নাম, সীমানা ও প্রাথমিক পর্যায়

১. শহরটির নামসমূহ :

বালাদুল্লাহিল হারাম, (আল্লাহর সম্মানিত শহর)। আল্লাহ (ﷻ) তাকে হারাম করেছেন, মর্যাদাবান করেছেন পবিত্র করেছেন এবং শহরটির সম্মানার্থে তার একাধিক নামকরণ করেছেন। কুরআন কারীমে বর্ণিত তার একাধিক নামগুলোর অন্যতম কয়েকটি নাম নিম্নে বর্ণিত হলো:

ক) মক্কা : এ নামটিই হচ্ছে সর্বাধিক পরিচিত নাম। আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেন :

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿الفتح:٢٤﴾

"তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত ওদের হতে বিরত রেখেছেন, ওদের উপর তোমাদের বিজয় করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।"[২]

খ) বাক্কা : এ পুণ্যভূমির আরেকটি নাম হলো 'বাক্কা'। আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন—

---

[২] সূরা ফাতহ ঃ ২৪

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿آل عمران:٩٦﴾

"অবশ্যই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় অবস্থিত। ওটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারি।"[৩]

গ) উম্মুল কুরা : তার অন্য একটি নাম হলো 'উম্মুল কুরা'।

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿الشورى:٧﴾

"এভাবে আমি তোমার প্রতি ওয়াহীর মাধ্যমে কুরআন নাজিল করেছি আরবি ভাষায় যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা ও তার চতুষ্পার্শ্বের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামতের দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আরেক দল প্রবেশ করবে জাহান্নামে।"[৪]

মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত মত হলো 'উম্মুল কুরা' দ্বারা মক্কাকেই বুঝানো হয়েছে। এ নামকরণের কারণ হলো এ শহরটি সর্বাধিক সম্মানিত এবং আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় শহর।[৫]

ঘ) আল-বালাদুল আমীন : তার অন্য একটি নাম হলো 'আল-বালাদুল আমীন' (নিরাপদ শহর)।[৬] আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এরশাদ করেন—

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. وَطُورِ سِينِينَ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿التين:-٣﴾

"কসম তীন ও যাইতূনের। কসম সিনাই পর্বতের। এবং কসম এ নিরাপদ শহরের।"[৭] আর 'আল-বালাদুল আমীন' দ্বারা সর্বসম্মতভাবে

---

৩ সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬

৪ সূরা শূরা ঃ ৭

৫ তাফসীর ইবনে কাসীর ৪/১০৭

৬ প্রাগুক্ত ১/৩/৮৩, আল-ফাসী, শিফাউল গারাম ১/৪৮

মক্কাকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়াও তার রয়েছে আরো প্রচুর নাম যেগুলো দিয়ে এ নিরাপদ শহরের (মক্কা) নামকরণ করা হয়েছে।

২. শহরটির সীমানা :

বিষয়টির গুরুত্ব এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট শার'ঈ আহকাম যা আল্লাহ (ﷻ) তার হারামের জন্য নির্ধারণ করেছেন– এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহীর মাধ্যমে হারামের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। জিবরীল (ﷺ) এ ঘরের নির্মাতা ইব্‌রাহীম (ﷺ)-কে হারামের সীমানা দেখিয়ে দেয়ার জন্য আগমন করলেন। তাঁর দেখানো মতে ইব্‌রাহীম (ﷺ) হারামের সীমানা স্থির করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে হারামের সীমানা পুনঃ নির্ধারিত হয়। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি আসাদ খুযা'ঈকে প্রেরণ করলে তিনি হারামের সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করেন।

আবূ না'ঈম ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) মক্কা বিজয়ের বছর আসাদ খুযা'ঈকে প্রেরণ করেন। তিনি হারামের সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করেন। ইব্‌রাহীম (ﷺ) এ সীমানা স্থির করেছিলেন যা তাঁকে জিবরীল দেখিয়ে দিয়েছিলেন।[৮]

আর এভাবেই প্রয়োজন অনুসারে আমাদের যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় হারামের সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করা হয়।[৯] ইমাম নাবাবী বলেন, হারামের

---

[৭] সূরা তীন ঃ ১-৩।

[৮] আল-ইসাবা ১/১৮৩, ইবনে হাজার বলেন- এ সনদের সহীহ।

[৯] আর এরই ধারাবাহিকতায় হারামের আশেপাশে অবস্থিত জনপদ ও পাহাড়ে অবস্থানের আলোকে হারামে মাক্কীর সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য মাসজিদে হারাম ও মাসজিদে নাবাবী বিষয়ক কমিটির সাবেক নির্বাহী সভাপতি ও মাসজিদে হারামের সম্মানিত ইমাম ও খাতীব শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আস্‌-সুবাইয়িলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারী করা হয়। কমিটি তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে মাক্কার অভ্যন্তরে সীমানা খুঁটি স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়।

সীমানা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর সাথে প্রচুর বিধি-বিধানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।[১০]

৩. হারামের প্রাথমিক পর্যায় ও সম্মানিত কা'বার নির্মাণ :

কা'বা শরীফ নির্মাণ, হারাম, কা'বা ও হজের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়টি আল্লাহর খলিল ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমা'ঈল (عليهما السلام)-এর সাথে সম্পৃক্ত যেমনটি কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে। হাফিজ ইবনে কাসীর বলেন, 'কুরআনের ভাষ্য মতে বুঝা যায় যে, ইব্‌রাহীম (عليه السلام) সর্বপ্রথম কা'বা নির্মাণের সূচনা করেন এবং কা'বার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন।[১১] যদিও এ বিষয় প্রাপ্ত অন্যান্য বক্তব্য ইতিপূর্বে নির্মিত কা'বার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌রাহীম খলিল (عليه السلام) কর্তৃক কা'বা নির্মাণ এবং তাঁর পুত্র ইসমা'ঈলের সহযোগিতা সম্পর্কে আল্লাহ (عز وجل) এরশাদ করেন :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿البقرة:١٢٧﴾

"এবং (স্মরণ কর), যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমা'ঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলছিল (তখন তারা বলেছিল) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (এ কাজ) গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"[১২]

কা'বা নির্মাণের ঘটনা ও হারাম শরীফের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বেশ কিছু সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ গ্রন্থে সা'ঈদ ইবনে জুবাইর হতে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। সা'ঈদ বলেন, ইবনে 'আব্বাস বলেছেন, মেয়েরা সর্বপ্রথম যে

---

[১০] তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ৩/৮২।

[১১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ২/২৭৭।

[১২] সূরা বাকারা ঃ ১২৭।

জিনিসটির ব্যবহার শুরু করে তা ছিল কোমর-বন্দ। ইতিপূর্বে ইসমা'ঈল (عليه السلام)-এর মাতা সারাহ্ থেকে তার ছাপ গোপন করার জন্য কোমরবন্দ ব্যবহার করেন। এরপর ইব্‌রাহীম (عليه السلام) তাঁকে ও তাঁর দুধ পানকারী পুত্র ইসমা'ঈলকে সাথে নিয়ে বাইতুল্লাহ্‌র নিকট মাসজিদের উঁচুস্থানে যামযামের উপর এক বড় বৃক্ষের নিচে নিয়ে আসেন। তখন মক্কা ছিল জনমানবহীন। ছিল পানিশূন্য। তিনি তাদেরকে সেখানে রেখে আসেন। রেখে আসেন তাদের জন্য এক পাত্র খেজুর ও এক মশক পানি। এরপর ফিরে আসার জন্য তিনি পিছন ফিরেন। তাঁকে অনুসরণ করেন ইসমা'ঈলের আম্মা-জান। তিনি বলতে থাকেন, হে ইব্‌রাহীম! যেখানে কোন মানুষ নেই, নেই কোন কিছু এমন এক স্থানে আমাদেরকে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি এ কথাটুকু বারবার বলতে লাগলেন। কিন্তু ইব্‌রাহীম তাঁর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে এ নির্দেশ দান করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ইসমাঈলের আম্মাজান বললেন, তাহলে তিনি (আল্লাহ্) আমাদের ধ্বংস করবেন না। এ বলে তিনি ফিরে আসেন। ইব্‌রাহীমও তাঁর পথে হাঁটা ধরলেন। হাঁটতে হাঁটতে যখন তিনি পাহাড়ি পথের এমন এক স্থানে পৌঁছালেন যেখানে তাঁকে তারা দেখতে পাবে না তখন তিনি বাইতুল্লাহমুখী হয়ে হাত তুলে নিম্নোক্ত দু'আ করেন, তিনি বলেন :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

﴿إبراهيم:٣٧﴾

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর ভূমিতে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং

ফলাদি দ্বারা তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করে দিন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"[১৩]

ইসমা'ঈলের মা ইসমা'ঈলকে দুধ পান করাতে থাকেন এবং তিনি স্বয়ং মশক হতে পানি পান করতে থাকেন। যখন মশকের পানি ফুরিয়ে গেল তখন তিনি পিপাসার্ত হলেন এবং তাঁর ছেলেও পিপাসার্ত হলো। তখন মা আড় চোখে অথবা (বর্ণনাকারী বললেন) অস্থিরচিত্তে- ছেলের দিকে তাকালেন। সন্তানের দিকে দৃষ্টি পড়ার ভয়ে মা সেখান থেকে উঠে গেলেন। সেখানে তিনি সবচেয়ে নিকটে সাফা পাহাড় দেখতে পেলেন। তিনি পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। এরপর খোলা বিস্তীর্ণ মরুভূমির দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। সাফা হতে নীচে নেমে এলেন তিনি। যখন তিনি ময়দানে পৌঁছে গেলেন তখন তিনি পোশাক কিছু উপরে তুলে পরিশ্রান্ত মানুষের মত দৌড়াতে দৌড়াতে ময়দান পার হয়ে মারওয়া পাহাড়ের নিকট এসে পৌঁছালেন এবং পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে চারিদিকে দেখতে লাগলেন কাউকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এভাবে সাতবার করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন : (এটা হলো সাফা মারওয়ার মাঝখানে মানুষের সা'ঈ। যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং নিজেকে নিজে বললেন, চুপ। এরপর আরো মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে শোনানো হয়েছে যে, তোমার নিকট সাহায্যকারী রয়েছে। হঠাৎ যমযমের স্থানে একজন ফেরেশতা দেখা গেল সে তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা (বললেন) তার পাখা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছে। একসময় সেখান থেকে পানি বেরোতে শুরু করল। ইসমাইলের মাতা তখন সে পানি হাউজের মত করে ধরে রাখার চেষ্টা

[১৩] সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৩৭।

করলেন[১৪] এবং কোষ ভরে মশক ভরতে লাগলেন। কোষ ভরে পানি উঠাবার পর নীচ থেকে প্রবলভাবে পানি উঠতে লাগল।

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন : 'আল্লাহ (سبحانه وتعالى) ইসমা'ঈলের আম্মাজানকে রহম করুন, তিনি যদি যমযমকে ছেড়ে দিতেন অথবা (বলেছেন) যদি তিনি কোষ করে পানি না তুলতেন, তাহলে যমযম একটি প্রবাহিত ঝর্ণাধারায় পরিণত হত। তিনি বলেন, ইসমা'ঈলের আম্মা পানি পান করলেন এবং সন্তানকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাঁকে বলল, ধ্বংসের ভয় করো না। কারণ, এখানে রয়েছে আল্লাহর ঘর যা এ বাচ্চা ও তাঁর পিতা নির্মাণ করবে। আর আল্লাহ (سبحانه وتعالى) তার পরিবারকে ধ্বংস করবেন না। ঘরখানা মাটির উপরে টিলার মত উঁচু ছিল। এখানে বন্যার পানি আসত। তখন বন্যার পানি ডানে বামে এ টিলা সরিয়ে নিয়ে যেত। এভাবেই দিন গড়াতে লাগল। একদিন জুরহাম গোত্রের একদল সফর সঙ্গী অথবা জুরহাম গোত্রের কোন এক উপশাখা কাদা নামক স্থানের পথ ধরে তাদের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিল। তারা মক্কার নিচু এলাকায় যাত্রা বিরতি করল। সেখানে তারা দেখতে পেল এক ঝাঁক পাখি পানি পানের জন্য উড়ছে। তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, পাখির এ দলটি পানির উপর ঘুরপাক খাচ্ছে। এ মরুভূমির সাথে রয়েছে আমাদের বহুদিনের পরিচিতি। এখানে কোন পানি ছিল না। এক অথবা দু'জনকে পাঠাও (ঘটনা জেনে আসুক)। তারা সেখানে গিয়ে পানির সন্ধান পেল। তারা ফিরে এসে পানি প্রাপ্তির খবর দিল। এরপর সবাই সেখানে রওয়ানা হল। তিনি বলেন, ইসমা'ঈলের আম্মা জান সেখানেই ছিলেন।

তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে আপনার পাশে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেবেন?

তিনি বললেন, অবশ্যই, তবে শর্ত হলো পানিতে তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না।

---

১৪ আল-ফাতাহ ৬/৪৬৩।

তারা বলল, ঠিক আছে।

ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন : ইসমা'ঈলের মাকে তারা পেলেন মানুষকে ভালোবাসতে। তারা সেখানে বসবাস শুরু করলো। এভাবে সেখানে বেশ কিছু বসতি গড়ে উঠলো। শিশু ইসমা'ঈল বড় হতে লাগলেন। তাদের কাছে তিনি আরবি শিখলেন এবং তিনি তাদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। পাশাপাশি তিনি বড় হলেন। যখন তাঁর বিয়ের বয়স হলো তখন তারা তাদের এক মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে সম্পন্ন করেন। ইতোমধ্যে ইসমা'ঈলের মা ইন্তিকাল করেন। ইসমা'ঈল বিয়ে করার পর একদিন ইবরাহীম (ﷺ) তার পরিবারের খবরাখবর জানার জন্য এখানে আসেন। তখন ইসমা'ঈল ঘরে ছিলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্ত্রী বললেন, আমাদের জন্য উপার্জনের সন্ধানে তিনি বাইরে গেছেন। এরপর ইবরাহীম তাদের খাওয়া দাওয়া ও অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে স্ত্রী বললেন, আমরা খুবই দুরবস্থায় আছি। অভাব অনটনে আছি। এ বলে তিনি ইবরাহীমের নিকট অভিযোগ করলেন।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, তোমার স্বামী ফিরে এলে তাকে আমার সালাম বলবে। তাকে এও বলবে সে যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে। ইসমা'ঈল ফিরে কিছু যেন আঁচ করতে পারলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কি কেউ এসেছিল। স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, আমাদের নিকট এমন এমন আকৃতির এক বুজুর্গ ব্যক্তি এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাকে আপনার সম্পর্কে জানিয়েছি। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমাদের সংসার কেমন চলছে? তাকে আমি জানিয়েছি আমরা খুবই কষ্টে আছি।

ইসমা'ঈল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কোন উপদেশ দিয়ে গেছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ। তিনি আপনাকে সালাম বলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, আপনি আপনার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করুন।

ইসমা'ঈল বলেন, তিনি ছিলেন আমার পিতা। তিনি তোমাকে পৃথক করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে। তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তিনি তাকে তালাক দেন। এরপর তিনি অন্য একজনকে বিয়ে করেন। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) যতদিন চেয়েছেন ইবরাহীম (عليه السلام) ততদিন আর আসেননি। একদিন তিনি এলেন তবে তিনি ইসমা'ঈলকে পাননি। তিনি ইসমা'ঈলের স্ত্রীর নিকট এসে তার নিকট ইসমা'ঈল সম্পর্কে জানতে চান।

ইসমা'ঈলের স্ত্রী বললেন, আমাদের জন্য উপার্জনের সন্ধানে তিনি বাইরে গেছেন। ইবরাহীম (عليه السلام) জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ তোমরা? এবং তিনি তাদের খাওয়া দাওয়া ও অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে স্ত্রী বললেন, আমরা খুবই ভাল ও সচ্ছল আছি এবং এজন্য তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। ইবরাহীম (عليه السلام) বললেন, তোমাদের খাবার কি? ইসমা'ঈলের স্ত্রী বললেন, গোশত। ইবরাহীম (عليه السلام) বললেন, তোমাদের পানীয় কি? ইসমা'ঈলের স্ত্রী বললেন, পানি। ইবরাহীম (عليه السلام) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাদের জন্য গোশত ও পানিতে বরকত দান করুন।

নবী (ﷺ) বলেছেন, সে সময় শস্য জাতীয় কোন খাদ্য ছিল না। যদি থাকত তাহলে তিনি তাদের শস্যের জন্যও দু'আ করতেন।

তিনি (ইবনে 'আব্বাস) বলেন, মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও যদি কেউ শুধু এ দু'টি জিনিসের উপর নির্ভর করে তবে তা তাদের জন্য উপযোগী হবে না।

ইবরাহীম (عليه السلام) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে তাকে আমার সালাম বলবে। আর তাকে তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখতে বলবে। ইসমা'ঈল (عليه السلام) যখন ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল? ইসমা'ঈলের স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিকট সুন্দর আকৃতির এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এসেছিলেন। স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন। তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন।

আমি তাকে আপনার সম্পর্কে জানিয়েছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আমাদের সংসার কেমন চলছে? তাকে আমি জানিয়েছি আমরা খুবই ভাল আছি। ইসমা'ঈল (عليه السلام) বললেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়ে গেছেন? ইসমা'ঈলের স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ। তিনি আপনাকে সালাম বলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপনি যেন আপনার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখেন সে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমা'ঈল বললেন, তিনি ছিলেন আমার পিতা। আর তুমি হলে দরজার চৌকাঠ। তিনি তোমাকে বহাল রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় ইবরাহীম (عليه السلام) অনেকদিন পর আবার আসলেন। তখন ইসমা'ঈল যামযাম কূপের নিকট এক বড় বৃক্ষের নীচে তাঁর একটি বর্শা ঠিক করছিলেন। তিনি যখন ইবরাহীমকে দেখতে পেলেন তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং একজন পিতা তার সন্তানের সাথে এবং সন্তান তার পিতার সাথে যে আচরণ করে তারা দু'জন পরস্পরের সাথে ঠিক সে আচরণই করলেন। এরপর ইবরাহীম বললেন, ইসমা'ঈল, আল্লাহ (سبحانه وتعالى) আমাকে একটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমা'ঈল বললেন, আপনার প্রভু আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তা বাস্তবায়ন করুন। ইবরাহীম বললেন, তুমি কি আমাকে সহযোগিতা করবে? ইসমা'ঈল বললেন, অবশ্যই আমি আপনাকে সহযোগিতা করব। ইবরাহীম বললেন, আল্লাহ (سبحانه وتعالى) আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ বলে তিনি পাশে একটি উঁচু টিলার মত স্থানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি বলেন, দু'জনে মিলে সেখানেই ঘর নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। ইসমা'ঈল পাথর এনে দিতেন আর ইবরাহীম তা দিয়ে নির্মাণ কাজ করতেন। যখন নির্মাণাধীন ঘর কিছুটা উঁচুতে উঠে গেল তখন এ পাথরটি সেখানে আনা হলো এবং ইবরাহীম তার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতেন, ইসমা'ঈল তাঁকে পাথর ধরিয়ে দিতেন। আর দু'জনে মিলে এ দু'আ পাঠ করতেন :

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾البقرة:١٢٧﴿

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের (এ কাজ) গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"[১৫]

তিনি বলেন, তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখলেন এবং দু'আ করতে থাকেন এ বলে,

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾البقرة:١٢٧﴿

"হে আমাদের রব! আমাদের (এ কাজ) গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"[১৬]

নির্মাণ শেষে এ ঘরটিই ছিল যমীনের উপর 'ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর। আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন :

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾آل عمران:٩٦﴿

"অবশ্যই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় অবস্থিত। ওটা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারি।"[১৭]

আবূ যার (رضي الله عنه) হতে ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জমিনের বুকে সর্বপ্রথম কোন ঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? তিনি বললেন, হারাম শরীফের মাসজিদ। তিনি বলেন, আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আক-সা। আমি প্রশ্ন করলাম, দু'টি মাস জিদ নির্মাণের মাঝে কতদিনের ব্যবধান ছিল। তিনি বলেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর তুমি যেখানেই থাক না কেন সালাতের

---

[১৫] সূরা বাকারা ঃ ১২৭।

[১৬] সূরা বাকারা ঃ ১২৭, সহীহ বুখারী- কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং- ৩৩৬৪।

[১৭] সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৬।

সময় হলে তুমি সেখানেই সালাত আদায় করে নেবে। কারণ, এতে রয়েছে ফজিলত।[১৮]

আল্লাহ (ﷻ) এ মর্মে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এতে তিনি অনেক স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছেন এবং রেখেছেন অনেক প্রকাশ্য দলিল। ঘরটি ইবরাহীম খালীল (ﷺ) কর্তৃক নির্মিত এবং আল্লাহ (ﷻ) এ ঘরকে সম্মানিত করেছেন এবং দান করেছেন মর্যাদা। তিনি বলেন :

فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿آل عمران:٩٧﴾

"তাতে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করবে সে হবে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশে সেই ঘরের হজ করা তার অবশ্যই কর্তব্য এবং কেউ তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।"[১৯]

কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, প্রকাশ্য নিদর্শনা বলীর একটি হলো মাকামে ইবরাহীম।[২০]

উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিস ও সালাফে স্বাস্থ্যহীনের বক্তব্যের আলোকে শহরটির একাধিক নাম, তার সীমারেখা, তার প্রাথমিক পর্যায় ও নির্মাণের সূচনা এবং পরবর্তীতে তাকে হারাম করার বর্ণনার মাধ্যমে উপর্যুক্ত আলোচনায় হারাম শরীফের মহান সম্মান ও উঁচু মর্যাদার কথা ফুটে উঠেছে।

---

[১৮] সহীহ বুখারী- কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং- ১০, ৩৩৬৬

[১৯] সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৭।

[২০] তাফসীরে ত্বাবারী ৪/৮

প্রথম অধ্যায়

হারাম শরীফের দেশের ফজিলত ও তার কতিপয় হুকুম

১. আল্লাহর সম্মানিত শহর মক্কার মর্যাদা :

আল্লাহ (ﷻ) যেদিন জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই এ ভূখণ্ডকে তিনি পছন্দ করেছেন এবং তাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন :

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿القصص:٩١﴾

"আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এ নগরীর মালিকের এবাদত করতে যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সকল কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই।"[২১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদিসও বিষয়টি প্রমাণ করে। ইবনে 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

এ শহরটিকে আল্লাহ সেদিন থেকেই সম্মানিত করেছেন যেদিন যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক হারাম হওয়ায় এ শহরটি কেয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে।[২২]

---

২১ সূরা নামল ঃ ৯১।

আল্লাহর খালীল ইবরাহীম (عليه السلام) মক্কা হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন। আল্লাহর ঘর কা'বা তিনি নির্মাণ করেন ও তাকে পবিত্র করেন এবং মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দেন। ইমাম বুখারি আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে 'আসিম (رضي الله عنه) হতে তিনি নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ لِمَكَّةَ.

ইবরাহীম মাক্কাকে হারাম ঘোষণা করেন এবং শহরটির জন্য দু'আ করেন। ইবরাহীম যেভাবে মাক্কাকে হারাম ঘোষণা করেন সেভাবে আমিও মদিনাকে হারাম ঘোষণা করেছি এবং তার মুদ্দ ও সা' (খাদ্য শস্য)-এর জন্য দু'আ করেছি যেমন ইবরাহীম (عليه السلام) মক্কার জন্য দু'আ করেছেন।

আল্লাহ মক্কা শহরটিকে জমিন ও আসমানকে সৃষ্টির দিন থেকেই হারাম করেছেন, ইতিপূর্বে বর্ণিত এ কথার সাথে উপরোক্ত হাদিসটি সাংঘর্ষিক নয়। যে হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে, ইবরাহীমই মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন সেগুলোর বর্ণনার পর হাফেজ ইবনে কাশীর বলেন, যে হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ শহরটিকে জমিন ও আসমানকে সৃষ্টির দিন থেকেই হারাম করেছেন এগুলো ঐ হাদিসগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক নয় যেগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবরাহীম (عليه السلام) এ শহরকে হারাম করেছেন। ইবরাহীম (عليه السلام) আল্লাহর পক্ষ থেকেই মক্কা সম্পর্কিত হুকুম এবং তাকে হারাম করার বিধান উম্মতকে দিয়েছেন। ইবরাহীম (عليه السلام) এ ঘর নির্মাণের পূর্ব থেকেই মক্কা বরাবরই হারাম ছিল। বিষয়টি ঠিক এমন যেমন বর্ণনাকারী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর নিকট 'খাতামুন নাবিয়্যীন' (সর্বশেষ নবী) হিসাবে লিপিবদ্ধ ছিলেন আর আদম

[22] সহীহ মুসলিম- কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং- ১৩৫৩।

তখন নিজ কাদা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন,[২৩] এতদসত্ত্বেও ইবরাহীম (عليه السلام) এ বলে দু'আ করলেন :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴿البقرة:١٢٩﴾

"হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন।"[২৪]

আল্লাহ তাঁর পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী ইবরাহীম (عليه السلام)-এর দু'আ মঞ্জুর করলেন। এ জন্যেই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সূচনা সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন। উত্তরে তিনি বললেন, (আমি হলাম) ইবরাহীম (عليه السلام)-এর দু'আ এবং 'ঈসা ইবনে মার্‌য়ামের সুসংবাদ। আমার আম্মা-জান দেখতে পেলেন, তাঁর থেকে এক ঝলক নূর বেরিয়ে এসেছে যে নূরের আলোয় শাম দেশের প্রাসাদগুলো পর্যন্ত দেখা গেছে। ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল (عليه السلام) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ সম্পর্কে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এরশাদ করেন :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿البقرة:١٢٧﴾

"এবং (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম ও ইসমা'ঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলছিল (তখন তারা বলেছিল) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের (এ কাজ) গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ব-শ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।"[২৫]

ইবরাহীম (عليه السلام) কর্তৃক আল্লাহর ঘরকে পবিত্রকরণ এবং মানুষের মাঝে আজান প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এরশাদ করেন:

---

[২৩] মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৭, বুখারী, কিতাবুল কাবীর ৬/৬৮, কিতাবুস সাগীর ১/৩৯, বায়হাকী, দালায়েল ২/১৩০, ইবনে হিব্বান, সহীহ হাদীস নং- ৬৪০৪, হাকিম, মুসতাদরাক ২/৬০০।

[২৪] সূরা বাকারা ঃ ১২৯।

[২৫] সূরা বাকারা ঃ ১২৭।

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

"এবং (স্মরণ কর) যখন আমি ইবরাহীমের জন্য করে দিয়েছিলাম সে ঘরের স্থান (তখন এও বলে দিয়েছিলাম যে,) আমার সাথে কোন শরিক করো না এবং আমার ঘর পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং সালাত কায়েম করে রুকূ' করে ও সিজদা করে এবং মানুষের নিকট হাজ্জের ঘোষণা দিন। তারা আপনার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে আসবে দূর-দরান্তের পথ অতিক্রম করে।"[২৬]

মূর্তি, শির্‌ক, জাহিলি কার্যকলাপ হতে পবিত্র করার লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের জন্য আল্লাহ এ শহরকে তাঁর জন্য হালাল করে দেয়ার পর আল্লাহর ঘর এবং হারাম শরীফের মহান মর্যাদা এবং কেয়ামাত পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ন থাকা প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ (عليه السلام) অত্যন্ত জোর দিয়েছেন।

এ শহরের সম্মান ও মর্যাদা পূর্বের মতই ফিরে আসে। আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنَّهَا لِي تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي.

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) মক্কা থেকে হস্তীবাহিনীকে বিরত রেখেছিলেন এবং মক্কার উপর তার বিশ্বস্ত রাসূল (ﷺ) এবং মু'মিনদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। এ মক্কা নগরী আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না এবং দিনের এক প্রহর আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছিল এবং আমার পর এ শহর কখনো আর কারো জন্য হালাল হবে না।[২৭]

---

[২৬] সূরা হাজ্জ ঃ ২৬-২৭।

[২৭] সহীহ বুখারী-কিতাবুল লুকুতা, সহীহ মুসলিম-কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং- ১৩৫৫।

অতএব মক্কা কেয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর হারাম হিসাবেই থাকবে। আর এ হারাম হওয়া মসজিদে হারাম এবং আশেপাশের সকল স্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ (ﷻ) এ সকল স্থানের হারাম হওয়ার বিধান মসজিদে হারামের সাথে একীভূত করে দিয়েছেন। আর তা করা হয়েছে মক্কা ও বাইতুল্লাহর সম্মানার্থে।

২. কুরআনে এ শহরকে নিয়ে আল্লাহর কসম খাওয়া :

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর মহা গ্রন্থ কুরআন কারীমের বেশ কিছু আয়াতে বালাদে হারামের কসম খেয়েছেন। যাকে নিয়ে কসম খাওয়া হয়েছে তার মহিমা প্রমাণ এবং আল্লাহ সুবহানাহুর নিকট তার মহান সম্মান ও মহান মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এ কসম খেয়েছেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন :

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾

"কসম তীন ও যাইতূনের। কসম সিনাই পর্বতের। এবং কসম এ নিরাপদ শহরের।"[২৮]

আর এ শব্দ দ্বারা বিষয়টির উপস্থাপন এ সম্মানিত শহরের মহানত্ব প্রমাণ করে। আল্লাহ (ﷻ) পুণ্যভূমির কসম খাওয়ার মাধ্যমে তাকে মর্যাদা দান করেছেন। কসমের মধ্যে তিনি ইঙ্গিতবাচক শব্দ **هَذَا** ব্যবহার করেছেন যা আল্লাহ (ﷻ)-র নিকট শহরটির মর্যাদা প্রমাণ করে। এরপর শহরটিকে **الأَمِينِ** বিশেষণে ভূষিত করেন। আর শব্দটি **فعيل** এর ওজনে ব্যবহার করে **فاعل** তথা **آمن** এর অর্থ ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ নিরাপদ শহর।

আল্লাহ (ﷻ) আরো বলেন :

لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾

---

২৮ সূরা তীন ঃ ১-৩।

“আমি কসম করছি এ শহরের আর আপনি এ শহরের অধিবাসী।”[২৯]

এটা অন্য একটি কসম। এখানেও ইঙ্গিতবাচক শব্দ بِهَٰذَا দ্বারা শক্তিশালী কসমের মাধ্যমে কসমের অন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. মক্কা ও মক্কা বাসীর জন্য ইবরাহীম খালীল (عليه السلام)-এর দু‘আ :

আমাদের প্রভু আল্লাহ (سبحانه وتعالى) তাঁর মহান কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম খালীলুর রহমান (عليه السلام) তাঁর সন্তান ইসমা‘ঈল ও নিজ স্ত্রী হাজার (عليه السلام)-কে বসবাস করিয়ে দেয়ার পর শহরটির অধিবাসীদের জন্য দু‘আ করেন। তিনি শহরটিকে নিরাপদ শহরে পরিণত কর এবং নিজ সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা হতে হিফাযত করার দু‘আ করেন। তিনি মুসলমানদের হৃদয়কে তাদের প্রতি এবং তাদের শহরের প্রতি অনুরাগী করে দেয়ার জন্য দু‘আ করেন। ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করার দু‘আ করেন এবং তাদের মধ্য হতে তাদের জন্য একজন নবী প্রেরণের দু‘আ করেন। এ ছিল নবীদের পিতা ইবরাহীম খালি লুর রহমান (عليه السلام)-এর মুবারক দু‘আসমূহ। আল্লাহ এর সবগুলোই তাঁর মহান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

---

[২৯] সূরা বালাদ ঃ ১-২।

"এবং (স্মরণ করুন) যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রভু! এ শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন। হে আমার প্রতিপালক! এ সকল মূর্তি তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত হবে। কিন্তু আমার অবাধ্য হলে তুমি তো মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর ভূমিতে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য যে তারা যে সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন। এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দিন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"[৩০]

আল্লাহ (ﷻ) আরো এরশাদ করেন :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

"হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শেখাবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। আপনি তো মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৩১]

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এ দু'আ কবুল করেন। অনুর্বর ভূমির এ জনপদের অধিবাসীকে তিনি ফল দ্বারা রিজিক দান করেন। এগুলো আমদানি করা হয় সকল উঁচু নিচু প্রান্তর হতে। এমনকি শীতের ফল পাওয়া যায় গ্রীষ্মের মওসুমে, আর গ্রীষ্মের ফল পাওয়া যায় শীতের মওসুমে। দু'আ কবুলকারী আল্লাহ মহা পবিত্র। সকল প্রশংসা মহানদাতা আল্লাহর জন্য।

---

৩০ সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৫-৩৭।

৩১ সূরা বাকারা ঃ ১২৯।

এ বালাদে হারামের অধিবাসীদের উপর আল্লাহ (ﷻ)-র নেয়ামত প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে ধন্য করার উল্লেখ মূলত: তাদেরকে এ নিয়ামাতরাজির ফজিলত সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাঁর ঘর ও হারামের সাথে বেয়াদবি করা হতে সতর্ক করার জন্যই করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন :

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয় আমার দেয়া রিজিক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"[৩২]

মুসলমানদের হৃদয়কে তাদের প্রতি এবং এ শহরের প্রতি অনুরাগী করে দেয়ার জন্য ইবরাহীম খলিল দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর এ দু'আ কবুল করেছেন। তিনি এ ঘরকে মানবজাতির মিলন কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বের সকল প্রান্ত হতে বছরব্যাপী মানুষের আগমন ঘটে এ শহরে। তারা এ শহর থেকে কেবল তাদের প্রয়োজন মিটায় না, বরং যতই এ শহরে তাদের আগমন ঘটে ততই এ শহরের প্রতি তাদের আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। কেননা আল্লাহ (ﷻ) ঈমানদারদের অন্তরে এ শহরের মহব্বত এবং এখানে আগমনের এক অনুরাগ দিয়েছেন।[৩৩]

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও সা'ঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আল্লাহ (ﷻ) যদি আয়াতে 'মানুষের অন্তর' বলতেন তাহলে পারসিক, রোমীয়, ইয়াহুদী, খৃষ্টানসহ সকল ধরনের মানুষেরা এ শহরে ভিড় জমাতো। কিন্তু আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন, 'কিছু মানুষের অন্তর', তাই (এ শহর) মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।[৩৪]

---

৩২ সূরা কাসাস ঃ ৫৭।

৩৩ ইবনুল কাইয়েম, যাদুল মা'আদ ১/৫১।

৩৪ তাফসীরে ইবনে জারীর ১৪/১৫৫, তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৫৪৯।

এ উম্মতের জন্য ইবরাহীম খালি লুর রহমান একজন রাসূল প্রেরণের যে দু'আ করেছিলেন, সে দু'আ আল্লাহ (ﷻ)-র পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উম্মিদের মাঝে রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষেই কবুল হয়েছে। এভাবে তিনি প্রেরিত হয়েছেন মানব ও জিন জাতির জন্য। 'ইরবাদ ইবনে সারিয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন : আমি আল্লাহর নিকট অবশ্যই 'খাতামুন নাবিয়্যীন' (সর্বশেষ নবী) হিসেবে ছিলাম, তখন আদম (عليه السلام) নিজ কাদা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। আমি অবশ্যই এ সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ দেব। এ ছিল আমার পিতা ইবরাহীম (عليه السلام)-এর দু'আ আমার সম্পর্কে 'ঈসার সুসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন যা তিনি দেখেছিলেন।

৪. আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় শহর :

এ সম্মানিত শহর সম্পর্কে শরিয়তের বিভিন্ন বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এ শহর আল্লাহ (عز وجل) এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় শহর।

ইবনে 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা শরীফের উদ্দেশে বলেন :

مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَمَا أَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِك أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ.

কতই না পবিত্র শহর তুমি, আমার নিকট তুমি কতই না প্রিয় শহর, যদি তোমার কাওম আমাকে বের করে না দিত তাহলে তুমি ছাড়া অন্য কোন শহরে আমি বসবাস করতাম না।

'আবদুল্লাহ ইবনে 'আদি ইবনে হামরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে খাযওয়ারা নামক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। সেখানে তিনি বলছিলেন :

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ.

'আল্লাহর কসম, আল্লাহর জমিনে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর নিকট তাঁর জমিনে তুমি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয়, যদি তোমার কাছ থেকে আমাকে বের করে দেয়া না হত তাহলে আমি তোমায় ছেড়ে যেতাম না।

৫. দাজ্জাল এ শহরে প্রবেশ করতে পারবে না :

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর নিরাপদ শহর মক্কা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শহর মা-দীনাকে সম্মানিত এভাবে করেছেন যে, এ দু'টি শহরে দজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। দজ্জাল হতে শহর দু'টির হেফাজতের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন করবে। তাই দজ্জাল আল্লাহর হারাম ও নিরাপত্তার শহর মক্কায় প্রবেশের সুযোগ পাবে না। সুযোগ পাবে না রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শহর মাদীনায়ে তায়্যেবায় প্রবেশের। আনাস (رضي الله عنه) হতে ইমাম বুখারি বর্ণিত হাদিসটি এর প্রমাণ। আনাস (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

এমন কোন ভূখণ্ড নেই যা দজ্জালের পদভরে মথিত হবে না। তবে মক্কা ও মানীদায় সে প্রবেশ করতে পারবে না। তার জন্য এমন কোন স্থান পাওয়া যাবে না যা গলে সে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে। প্রতিটি স্থানে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে মা-দীনার হেফাযতে করছে। এরপর মাদিনা তার অধিবাসীসহ তিনটি ঝাকুনি খাবে যার মাধ্যমে আল্লাহ মদিনা থেকে সকল কাফির ও মুনাফেককে বের করে দেবেন।

ইমাম মুসলিমের নিকট তামীম দারি (رضي الله عنه)-এর একটি বর্ণনা যাতে মসীহ দাজ্জালের একটি উক্তি রয়েছে যে, "খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি জমিন চষে

ফেলব। চল্লিশ রাত্রিতে জমিনের সকল জনপদে আমি উপস্থিত হব। তবে মক্কা ও তাইবা (মদিনা)-য় আমি প্রবেশ করতে পারবো না। এ দু'টি জনপদ আমার উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে। যখনই আমি একটি অথবা এ দু'টির কোন একটি জনপদে প্রবেশের চেষ্টা করব সাথে সাথে আমাকে ধারালো তরবারি হাতে একজন ফেরেশতা (সে জনপদে প্রবেশ করতে) বাধা দেবে। প্রতিটি প্রবেশ স্থানে ফেরেশতা রয়েছে যারা মদিনায় হেফাযতে করছে।" আমরা দজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

৬. ঈমানের প্রত্যাবর্তন :

সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। হাদিসে নবী (ﷺ) বলেছেন : ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত হিসেবে এবং সূচনার মতই আবার তা অপরিচিত অবস্থার দিকে ফিরে যাবে। আর তা পুনরায় দু'টি মসজিদে ফিরে আসবে, যেমন সাপ নিজ গর্তে ফিরে আসে।[৩৫]

ঈমান নাবাবী (রহ.) বলেন, দু'টি মসজিদ দ্বারা মক্কা এবং মদিনার মসজিদকে বুঝানো হয়েছে।[৩৬]

৭. মসজিদুল হারামে সালাত আদায়ের সওয়াব :

মসজিদুল হারাম সর্বপ্রথম ঘর যা মানব জাতির জন্য নির্মিত হয়েছে। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) এ মাসজিদের সালাত আদায়কারীদের সম্মানিত করেছেন বহুগুণ ছাওয়াব প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন সালাত আদায়কারীদের প্রতি পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পবিত্র ঘর একটি বিরাট অনুগ্রহ।

হায় আফসোস তাদের জন্য যারা পবিত্র মক্কায় বসবাসরত, আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী, যাদের জন্য এখানে সাওয়াব অর্জনের সমস্ত দরজা মুক্ত, কিন্তু তবুও সালাতের ব্যাপারে তারা অনীহা প্রদর্শন করত ফরজ সালাত

---

৩৫ সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ১৪৬।
৩৬ শরহে মুসলিম ২/১৭৭।

তারা ছেড়ে দেয়। এর চেয়ে হতভাগা, ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত আর কে হতে পারে?

আবূ হুরাইরা (ﷺ) হতে বর্ণিত, হাদিস নবী (ﷺ) এরশাদ করেছেন:

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

আমার এ মসজিদে সালাত আদায়ের ছাওয়াব মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য সকল মসজিদে সালাতের চেয়ে হাজার গুণ উত্তম।[৩৭]

জাবির (ﷺ)-এর বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ الحَرَمِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ.

আমার মসজিদে একবার সালাত আদায় মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে হাজার বার সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি উত্তম। তবে মাসজিদুল হারামে একবার সালাত আদায় অন্যান্য মাসজিদের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বেশী।[৩৮]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, মাসজিদুল হারামের যে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে, এর দ্বারা কাবা ঘরকে পরিবেষ্টনকারী মসজিদুল হারামকে বুঝানো হয়েছে, না সম্পূর্ণ হারাম এলাকা ?—এ ব্যাপারে ওলামা ও মুসলিম জ্ঞানীদের মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কা'বা ঘরের চারপাশকে পরিবেষ্টনকারী মসজিদুল হারামকে হারাম এলাকা অর্থ করেছেন, আবার কেউ কেউ হারামের সীমারেখা ভুক্ত এলাকাকে বুঝিয়েছেন। তবে অধিকাংশ ওলামা শেষোক্ত মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রাধান্য দান কারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাবেঈ 'আতা ইবনে আবি রাবাহ আল-মককী (ﷺ) একজন। তৎকালীন মসজিদুল হারামের তিনি ইমামও ছিলেন। একবার রাবী' ইবনে সুবাইহ (ﷺ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, "হে

---

[৩৭] সহীহ বুখারী- হাদীস নং ১১৮৮, সহীহ মুসলিম- হাদীস নং ১৩৯৪।

[৩৮] মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৪৩, ইবনে মাজাহ ১৪০৬, সহীহ ইবনে খুযাইমা ১১৫৫।

আবূ মুহাম্মাদ! মসজিদুল হারাম সম্পর্কে যে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এটা কি কেবল মাসজিদের জন্য, না সম্পূর্ণ হারাম এলাকার জন্য? জবাবে আতা' বললেন, এর দ্বারা সম্পূর্ণ হারাম এলাকাই বুঝানো হয়েছে, কারণ হারাম এলাকার সবটাই মসজিদ বলে গণ্য করা হয়।"[৩৯] ইমাম ইবনেল কাইয়্যিমও একই মত প্রকাশ করেছেন। একই বিষয়ে তাঁর রচিত একটি চমৎকার প্রবন্ধ রয়েছে।[৪০] অধিকাংশ ওলামার মত এটাই। বর্তমান যুগের শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায (রহ.) এ মতকে দিয়েছেন।[৪১]

উল্লেখিত মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্তত এতটুকু বলা যায় যে, কাবা ঘরের চারপাশে সালাত আদায় সবচেয়ে উত্তম। কেননা সেখানে সালাতের কারণে মনের প্রশান্তি, দিলের প্রশস্ততা, বিপুল সংখ্যক মুসল্লীদের সঙ্গ লাভ এবং সেই সঙ্গে কা'বা ঘরের নৈকট্য অর্জন সম্ভব হয় বলেই এর মর্যাদা অনেক বেশি। ইমাম আহমাদ (রহ.) সহ কোন কোন আলেম পবিত্র মক্কা নগরীর সর্বত্র অগণিত ছাওয়াব পাওয়া যায় বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। ইমাম নাবাবী (রহ.) এ মতকে বেশি পছন্দ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাই-মিয়া (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন : মক্কা মুকাররমার নিকট সালাত বা এ জাতীয় এবাদত উত্তম। এমন স্থানের পাশেও এবাদত উত্তম যেখানে ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধি হয়। সেই স্থানটি যেখানেই থাক না কেন। আর গুনাহ ও ছাওয়াব বৃদ্ধির বিষয়টি পবিত্র স্থান ও সময়ের সাথে জড়িত। আল্লামা আল-কাদী ও ইবনুল জাওযী (রহ.) ইবনে তাইমিয়্যার এ বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন।[৪২]

৮. হারাম শরীফে ইলহাদ (পাপাচার) নিষিদ্ধ :

আল্লাহ (ﷻ) তার পবিত্র গ্রন্থে মক্কা মুকাররমায় ইলহাদ তথা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করে দিয়েছেন এবং

---

৩৯ মুসনাদুত তায়ালিসী- হাদীস নং ১৪৬৪।

৪০ যাদুল মা'আদ ৩/৩০৩-৩০৪।

৪১ মাজমু'উ ফাতাওয়া ইবনে বায ৪/১৪০।

৪২ আল-ইখতিয়াবুল ফিকহিয়্যাহ লিইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ১১৩।

যারা এতে লিপ্ত হবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ও চরম লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করেছেন। সূরা হজের ২৫ নং আয়াতে তিনি এরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿الحج:٢٥﴾

"নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে এবং আল্লাহর রাস্তা এবং মসজিদুল হারাম হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যাকে আমরা মুকিম ও মুসাফির সকলের জন্য আশ্রয়স্থান করেছি; আর এখানে যে সামান্যতম পাপাচারের ইচ্ছে পোষণ করবে তাকে আমি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা।"[৪৩]

ইবনে জারির (রহ.) ইলদাহ শব্দের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, বায়তুল্লাহিল হারামে অন্যায় কাজের ইচ্ছে করা।[৪৪]

কোন কোন আলেম ইলহাদ দ্বারা শিরক বুঝিয়েছেন এবং অন্যান্য আলেমগণ হারাম শরীফ হারাম কাজকে তাকে হালাল মনে করা অথবা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ পবিত্র মক্কায় খাদ্যদ্রব্যকে গচ্ছিত করা বলেছেন। উল্লেখিত এ মতামতসমূহ তাফসীর তাবারী গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৫]

সার কথা হল, কুরআনের এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, মক্কা নগরীতে যে কোন ধরনের পাপাচারকেই ইলহাদ বলা হয়। এটাই যুক্তিসংগত এবং সঠিক। আল্লাহর নাফরমানি হয় এমন যে কোন কর্মকাণ্ডকে 'ইলহাদ' বলা হয়। উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাসীর (রহ.) বিভিন্ন মনীষীদের মতামত উল্লেখ করে বলেন, এ সকল বক্তব্য ও মতামত থেকে যদিও প্রমাণিত হয় যে,

---

৪৩ সূরা হাজ্জ ঃ ২৫।

৪৪ তাফসীর তবারী ১৭/১০৩।

৪৫ তাফসীর তবারী ১৭/১০৪।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর সবটাই ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল 'ইলহাদ' এর চেয়েও আরো ব্যাপক। বরং আয়াতে এর চেয়ে জঘন্যতম পাপের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। এজন্য হস্তবাহিনী যখন আল্লাহর ঘর ধ্বংসের মনস্থ করেছিল, তখন আল্লাহ আবাবিল পাখির দ্বারা তাদেরকে সমূলে খতম করেছিলেন, বরং তাদের উচিত শাস্তি থেকে অন্যরা যেন নসিহত গ্রহণ করে এবং কা'বা ঘরে অন্যায়ের চিন্তাকারীদের জন্য এই আয়াত একটি কঠোর হুশিয়ারী।[৪৬]

শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায বলেন : 'ইলহাদ' শব্দটি সকল অন্যায়ের দিকে ঝোঁক প্রবণতাকে শামিল করে থাকে। তা আক্বীদার ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে। সব অন্যায়কে বুঝাতেই কুরআনের إِلْحَادٍ শব্দটি 'নাকেরা'। অর্থাৎ অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব যে কেউ যে কোন ধরনের ইলহাদে লিপ্ত হবে সে এ সতর্ক বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর হারাম শরীফে যে কোন অপরাধকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে এরূপ করবে সে হবে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্যতম ব্যক্তি। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদিসে নবী (ﷺ) বলেছেন, তিন ধরনের লোক আল্লাহ নিকট বেশি ঘৃণিত। হারাম শরীফের মধ্যে অন্যায়কারী, ইসলামের ভেতরে জাহিলি রীতি-নীতি অন্তর্ভুক্তকারী এবং অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যাকারী।[৪৭]

হাদিস বিশারদ আল-মুহাল্লাসহ আরো অনেকে বলেন, এ তিন ধরনের ব্যক্তি দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এরা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত পাপী। যেমন তিনি (ﷺ) বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে শিরকই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সকল গোনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ঘৃণিত অপরাধ।[৪৮]

---

[৪৬] তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/১২৫।

[৪৭] সহীহ বুখারী- হাদীস নং ৬৮৮২।

[৪৮] ফাতহুল বারী ১২/২১৯।

মহান সাহাবি ইবনে ওমর (ﷺ) হারাম শরীফে ইলহাদের মত অপরাধকে কবিরা গুনাহ গণ্য করেছেন। ইমাম তা বারী তার তাফসীর গ্রন্থে তাইসালাহ ইবনে ‘আলী আন্নাহদী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আরাফার দিবসে ইবনে ওমরের নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন আরাক নামক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং মাথায় ও মুখে পানি ঢালছিলেন। আমি তাকে বললাম, আমাকে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, কবীরা নয়টি। বললাম সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা। (২) সতী-সাধ্বী মহিলার উপর অপবাদ দেয়া। প্রশ্ন করলাম, এর স্থান কি হত্যারও পূর্বে? বললেন, অবশ্যই, হ্যাঁ। (৩) কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা। (৪) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। (৫) যাদু। (৬) সুদ খাওয়া। (৭) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা। (৮) মুসলিম মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (৯) জীবিত অথবা মৃত তোমাদের সকলের কিবলা হারাম যে কোন ধরনের ইলহাদ করা।[৪৯]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে অন্যায় কর্মের নিছক ইচ্ছা পোষণ করার জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে যদিও সে বাস্তবে সে ইচ্ছা পূরণ করেনি। তাহলে যে বাস্তবে অন্যায় করবে তার অবস্থা কেমন হবে? তাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) বলেছেন, ইয়ামানে অবস্থিত এডেন শহরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদি হারামে কোন ধরনের অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন![৫০]

ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, কোন কোন আলেম মন্তব্য করেছেন যে, পবিত্র মক্কায় যদি কেউ কোন পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তবে আল্লাহ তাকে শুধুমাত্র সেই ইচ্ছা পোষণের কারণে তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন, যদিও সে বাস্তবে সেই অন্যায় কর্মটি না করে থাকে। তবে

---

৪৯ তাফসীর ইবনে জারীর ৫/২৬, সহীহ আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ৩৫।

৫০ মুসনাদে আহমাদ ২/৪২৮ পৃঃ, তাফসীর তাবারাী ১৭/১০৪ পৃঃ।

হারাম এলাকার বাইরে কোন অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করার কারণে শাস্তি প্রাপ্তি হবে না।[৫১]

শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায (রহ.) বলেন : হারাম শরীফে কৃত গুনাহ অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। হারাম শরীফে অন্যায়ের শাস্তি খুবই কঠিন। কুরআনের এ আয়াতে তা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন, যে এখানে (হারাম শরীফে) ইলহাদ অর্থাৎ জুলুম করার মনস্থ করবে তাকে আমি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দেব।

৯. মক্কাবাসীদের কষ্ট দেয়া ও সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ :

সংশ্লিষ্ট বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। বরং এ সম্মানিত নগরীর পবিত্রতা রক্ষার সাথে বিষয়টি জড়িত। ইবরাহীম (عليه السلام) আল্লাহর ঘরটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করর পর এ শহর ও শহরটির অধিবাসীদের জন্য আল্লাহর নিকট কিছু বরকতময় দু'আ করেছিলেন, কয়েকটি দু'আর উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বায়তুল্লাহিল হারাম সম্পর্কিত সেই আয়াতগুলো আমাদেরকে নবী ইবরাহীম খালীল (عليه السلام)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ (ﷻ) বলেন :

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

"তারা বলে, আমরা যদি তোমার দীনের অনুসরণ করি তাহলে আমাদের ভূমি থেকে আমাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে। অথচ আমি কি তাদের জন্য নিরাপদ স্থান হারাম শরীফে দেইনি। যেখানে রিজিক হিসেবে সর্বপ্রকারের ফলমূল আমদানী হয়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।"[৫২]

আল্লাহ (ﷻ) আরো এরশাদ করেন :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا

---

৫১ তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/২১৫ পৃঃ।

৫২ সূরা কাসাস ৫৮।

"যখন আমি কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং শান্তির আলোয় করলাম।"[৫৩]

তিনি বলেন :

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾

"তীন, যাইতুন, তূর পর্বত এবং এ নিরাপদ শহরের শপথ।"[৫৪] আল্লাহ (ﷻ) আরো বলেন—

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

"তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি, অথচ এর চারপাশে যারা আছে, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়।"[৫৫]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) মক্কা মুকাররমার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এ শহরটি সার্বক্ষণিক পবিত্র। বড় বড় জালিম-স্বৈরাচারের অধীনস্থ, ভূমিধস, ভূমিকম্প সহ বিভিন্ন বিপর্যয় থেকে এ ঘর এখনও সংরক্ষিত ও পবিত্র অবস্থায়।[৫৬]

এ কারণেই মক্কা নগরীতে বিনা প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, মক্কা নগরীতে যে কোন ধরনের অস্ত্র বহন করা তোমাদের কারো জন্য বৈধ নয়।[৫৭]

---

৫৩ সূরা বাকারা ১২৫।
৫৪ সূরা তীন ১-৪।
৫৫ সূরা আনকাবূত ৬৭।
৫৬ তাফসীর কুরতুবী ২/১১৭ পৃঃ।
৫৭ মুসলিম হাঃ ১৩৫৬।

ক্বাযী আয়াদ (রহ.) বলেন, মুহাদ্দিসীনের দৃষ্টিতে হাদিসটি মক্কায় ইবনো কারণে অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ করণের সাথে সম্পৃক্ত, তবে প্রয়োজন হলে তা হবে বৈধ। ইমাম মালিক, শাফেয়ি এবং আতা' (রহ.) এ মত ব্যক্ত করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে হাসান বসরী (রহ.) হাদিসের বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে কোন অবস্থায় অস্ত্র ধারণ করাকে মাকরূহ মনে করেন।[৫৮]

বাকি রইল লড়াই বা কিতাল করা। আল্লাহর নবী (ﷺ) হারাম শরীফে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন। ইমাম বুখারি (রহ.) এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন, যার শিরোনাম হচ্ছে, মক্কায় যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ। কাজী আবূ শুরাইহ (رضي الله عنه) নবী (ﷺ) হতে হাদিস বর্ণনা করেন যে, মক্কায় রক্তপাত করা যাবে না। অতঃপর তিনি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর পূর্বোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন, যেখানে আল্লাহর নবী (ﷺ) এরশাদ করেছেন :

وَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ-"এটা এমন একটি নগরী, আল্লাহ যাকে আসমান-জমিনের সৃষ্টি লগ্ন হতে হারাম করেছেন। অতএব আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করার কারণে শহরটি কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে।"[৫৯]

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) তাঁর রাসূল (ﷺ) মুমিনদেরকে কাফিররা আগে হামলা না করলে মক্কায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও হত্যাকাণ্ড ঘটানোর অনুমতি দেননি। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেন—

---

[৫৮] ইমাম নাবাবী কৃত মুসলিমের শারাহ ৯/১৩০ পৃঃ।

[৫৯] বুখারী হাঃ ১৮৩৪।

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

"তোমরা কাবা ঘরের পাশে কখনো তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের আক্রমণ না করে। তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ কর। এভাবেই কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। [৬০]

আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমল করেছেন। যারা অস্ত্র সমর্পণ করেছে তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিকদের যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। তিনি একজন ঘোষক প্রেরণ করেন যে ঘোষণা দেয়, যারা মসজিদুল হারামে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ। যারা স্ব গৃহে দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে তারা নিরাপদ। যারা আবূ সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ। তিনি সাহাবিগণকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। তবে যারা তাদের (মুসলিম) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং অস্ত্র ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইর অনুমতি দেন।

অতএব হারাম শরীফে অবস্থানকারী ও আগমনকারী সকলকে সাবধান থাকতে হবে য, হারাম শরীফের পবিত্রতা নষ্ট করা যাবে না, আর না এখানকার কোন লোককে কষ্ট দেয়া যাবে। এমনকি কোন ধরনের ভীতি প্রদর্শন ও অবৈধ। কেননা এগুলো জঘন্য অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

মহান আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেন :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

"এখানে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান, যার মধ্যে 'মাকামে ইবরাহীম' একটি। অতএব যে এ নগরীতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা পাবে।"[৬১]

অর্থাৎ যে এখানে প্রবেশ করল তাকে নিরাপত্তা দেয়া উচিত। তাকে যেন কোন কষ্ট দেয়া না দেয়া হয়। ইবনে কাসির (রহ.) আয়াতের

---

[৬০] সূরা আল-বাকারা ১৯১।

[৬১] সূরা আলে-ইমরান ৯৭।

ব্যাখ্যায় বলেন যে, কোন ভীত-সন্ত্রস্ত লোক মক্কায় হারাম নগরীতে প্রবেশ করে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে যে নিরাপত্তা পাবে। জাহেলী যুগে এখানকার নিরাপত্তা অনুরূপ ছিল।[৬২]

শেখ আবদুল আযীয ইবনে বায (রহ.) উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রতিটি প্রবেশকারীকে নিরাপত্তা দেয়া জরুরি। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, এখানে কাউকে কষ্ট দেয়া হয় না বা খুনের ঘটনা ঘটে না, এরূপ ঘটনা ঘটাও স্বাভাবিক। বরং আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে হারাম শরীফে প্রবেশকারীকে অবশ্য নিরাপত্তা দিতে হবে, তার সাথে কোন অন্যায় আচরণ করা যাবে না। জাহেলী যুগে এ মানের নিরাপত্তাই বুঝা যেত। যেমন কেউ যদি হারামের সীমানার ভেতরে নিজের পিতা বা ভাইয়ের হত্যাকারীকে কাছে পেত, তাকে কিছু করত না। যতক্ষণ না সে সীমানার বাইরে বেরিয়ে আসত।[৬৩]

১০. মক্কা নগরীতে কাফের ও মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ :

আল্লাহর নিরাপদ শহর মক্কার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোন ইয়াহুদী ও নাসারা বা অন্যান্য যেমন ইয়াহুদী-নাসারাকে এ নগরে বসবাসের অনুমতি নেই। কারণ এ পর্যায়ের মুশরিকগণ সম্পন্ন নাপাক। আর আল্লাহর ঘর হচ্ছে পাক ও পবিত্র। অতএব নাপাক লোককে পবিত্র ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যায় না।

আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! মুশরিকগণ সম্পূর্ণ নাপাক। অতএব তারা যেন এ বছরের পর হতে মসজিদুল হারামের কাছে না যায়। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে

---

৬২ তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৮৪ পৃঃ।
৬৩ ফাতাওয়া ঃ ইবনে বায, ১/৩৮৪ পৃঃ।

তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান।"[৬৪]

মহান আল্লাহর নির্দেশটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নবম হিজরি সালে আবূ বকর (رضي الله عنه)-কে মক্কায় পাঠালেন এ ঘোষণা দেয়ার জন্যে যে,

أَنْ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

"এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং উলঙ্গাবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।"[৬৫]

কুরতুবী (রহ.) বলেন, সমস্ত ওলামার ঐকমত্য হচ্ছে যে, মুশরিকদের জন্য হারাম এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। এমনকি তাদের পক্ষ থেকে যদি কোন দূত আসে তাহলে তার কথা শোনার জন্য রাষ্ট্রনায়ক মক্কার হারামের বাইরে অর্থাৎ হিল্-এ যাবেন। যদি কোন মুশরিক গোপনে সেখানে ঢুকে, অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার কবর খোদাই করে তার মরদেহ ও হাড়-মাংস বের করে বাইরে নিয়ে যেতে হবে।[৬৬]

এই আয়াতে মসজিদুল হারাম বলতে হারামের সমগ্র এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। কেবল কাবা ঘরের পরিপার্শ্বের মসজিদই নয়। এই আয়াত দ্বারা কতক ওলামা হারাম শরীফে সালাত আদায়ের কয়েকগুণ সাওয়াবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত মসজিদ শুধু না বরং সমস্ত হারাম এলাকা এ সাওয়াবের আওতাধীন রয়েছে। কেননা আল্লাহ (سبحانه وتعالى) মসজিদুল হারাম বলতে সমস্ত হারাম এলাকা বুঝিয়েছেন। (বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে)

১১. হারাম এলাকায় শিকার করা, সেখানকার গাছ কাটা এবং পথে পড়ে থাকা কোন জিনিস উঠানো নিষিদ্ধ :

---

৬৪ সূরা তাওবা ঃ ২৮।

৬৫ সহীহ বুখারী- হাদীস নং ১৬২২।

৬৬ তাফসীর কুরতুবী- ৮/১০৪ পৃঃ।

ইমাম বুখারি ও সহীহ মুসলিম আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ যখন তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি জনতার সম্মুখে বক্তব্য রাখলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করেন, অতঃপর বললেন :

إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ....

"আল্লাহ (ﷻ) হস্তীর দল থেকে মক্কাকে রক্ষা করেছেন এবং সেই মক্কার উপর তাঁর রাসূল (ﷺ) ও মু'মিনদের বিজয় দান করেছেন। এই মক্কাকে আমার আগে কখনো হিল (হালাল) করা হয়নি, তবে আজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তাকে হিল (লড়াই করার জন্য অনুমোদন প্রদান) করা হল এবং আজকের পর আর কখনো এটাকে হালাল করা হবে না। অতএব এখন থেকে কোন পশুকে তাড়ানো যাবে না, এখানকার কোন কাঁটা তোলা যাবে না। এখানকার পড়ে থাকা কোন জিনিস কুড়ানো যাবে না। তবে কারোর হারানো বস্তু উঠানো যাবে যদি উদ্দেশ্য থাকে তাকে সেটা পৌঁছানোর উপযোগী হয়।" (সংশ্লিষ্ট হাদিসটি আগে উল্লেখিত হয়েছে)

উল্লেখিত হাদিসটিতে মক্কার হারাম শরীফ সম্পর্কে কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো : এক : মক্কার কোন শিকারকে তাড়ানো ও হত্যা করা হারাম করা হয়েছে। দুই : মক্কায় কোন বৃক্ষকে কর্তন করা হারাম করা হয়েছে। তিন : পড়ে থাকা কোন জিনিস উঠানো যাবে না, তবে হারানো বিজ্ঞপ্তিকারীর জন্য নিষেধ নেই। এগুলো হচ্ছে মক্কা নগরীর সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধি-নিষেধ, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ সমস্ত বিধি-বিধান বলবৎ থাকবে। অতএব এখানকার প্রতিটি নাগরিক এবং বিশেষ করে হজ ও ওমরাহ

পালনের উদ্দেশে আগত ব্যক্তিদের জন্য এগুলো মেনে চলা অবিশ্যি কর্তব্য। এ পবিত্র নগরীর পবিত্রতা লঙ্ঘন তার সম্মানহানি এবং আল্লাহর বিধান অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

এখানে আমরা উল্লেখিত তিনটি বিধান (মাস-আলা) সম্পর্কে বিস্ত ারিত আলোকপাত করতে চাই।

(ক) মক্কার কোন শিকারকে তাড়ানো বা হত্যা করা নিষিদ্ধ :

আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর উল্লেখিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মক্কার কোন শিকার তাড়ানো যাবে না।" বক্তব্যটি কোন প্রাণী বা শিকারকে তাড়ানোর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। সেজন্য ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহীহুল বুখারি গ্রন্থে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র অধ্যায় (বাব) রচনা করেছেন এভাবে হারাম শরীফের শিকারকে তাড়ানো যাবে না। তিনি নিজ সনদে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে অন্য এক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

নবী (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ.

অর্থাৎ- "আল্লাহ মক্কা নগরীকে হারাম করেছেন। সুতরাং আমার পূর্বে কারো জন্য এটা হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য এটাকে হালাল সাব্যস্ত হবে না। তবে শুধু আজকের দিনে স্বল্প সময়ের জন্য এ শহরকে আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। কাঁটা ও লতাপাতা কাটা যাবে না। এখানকার বৃক্ষ কাটা যাবে না। শিকারকে তাড়ানো যাবে না, হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী ছাড়া পড়ে থাকা জিনিস উঠানো যাবে না। আব্বাস (رضي الله عنه) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে ঘাস জাতীয় জিনিস যা

আমাদের পশুর খাদ্য এবং কবরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে! তিনি বললেন, তবে ঘাস জাতীয় জিনিস। (অর্থাৎ এগুলো নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত)[৬৭]

শিকারকে তাড়ানোর অর্থ হলো স্বস্থান থেকে তাকে সরিয়ে দেয়া বা হটিয়ে দেয়া। ইমাম নাবা (রহ.) বলেন, শিকারকে তাড়ানো নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তাকে নিজের স্থান থেকে হটিয়ে দেয়া বা তাকে সেখানে বিরক্ত করা। যদি সরিয়ে দেয়ার কারণে ঐ শিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা মারা যায় (বা সে ক্ষতি যদি নাও হয়), তবুও সে গুনাহ্গার বলে গণ্য হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা মারা গেলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, অন্যথায় তাকে কিছুই দিতে হবে না। একই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইকরামাহ (ﷺ)। তিনিই ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে হাদিসটির বর্ণনাকারী। হাদিস বর্ণনা শেষে তিনি বললেন, “শিকারকে তাড়ানো যাবে না”-এর অর্থ কি, তুমি জান? এর অর্থ হল, তাকে ছায়া থেকে সরিয়ে দেয়া অথবা নিজ স্থান থেকে সরিয়ে দেয়া।[৬৮]

বিবেচ্য বিষয় হলো, সাধারণ শিকারকে তাড়ানো যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে তাকে হত্যা করা বা শিকার করা আরো বড় হারাম। ইকরা-মা (ﷺ)-এর ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করার পর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন যে, মূলত ইকরামাহ (রহ.) এ ব্যাখ্যার দ্বারা শিকারের ক্ষতি সাধনসহ সব ধরনের ক্ষতিকারক পদক্ষেপ গ্রহণ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি এটা বলেছেন, ছোট ধরনের অন্যায় যদি নিষিদ্ধ থাকে তাহলে বড় ধরনের অন্যায়ের নিষিদ্ধতা আরো বেশি।[৬৯]

ইবনুল মুন্‌যের (রহ.) বলেন, তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, হারাম শরীফের শিকারকে শিকার করার নিষিদ্ধতা অন্যান্য হালাল-হারামের চেয়ে বড়।[৭০]

---

[৬৭] সহীহ বুখারী- হাদীস নং ১৮৩৩।
[৬৮] ফাতহুল বারী ৪/৪৬ পৃঃ।
[৬৯] ফাতহুল বারী ৪/৬ পৃঃ।
[৭০] আল-ইজমা ৬৮ পৃঃ।

তবে কষ্টদায়ক জীবকে হত্যা কর হারাম এলাকায় হোক অথবা বৈধ এলাকা শরিয়তে বৈধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে। বুখারি ও মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

অর্থাৎ- "পাঁচ ধরনের ক্ষতিকর প্রাণী রয়েছে যেগুলো হত্যা করতে কোন দোষ নেই। (১) কাক, (২) বিচ্ছু, (৩) চিল, (৪) ইঁদুর ও (৫) হিংস্র কুকুর।"[৭১]

আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হাদিসে নবী (ﷺ) বলেন :

خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحُرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

অর্থাৎ- "পাঁচ ধরনের প্রাণীর সবগুলোই ক্ষতিকারক, যেগুলোকে হারামেও হত্যা করা যায়। (১) কাক, (২) চিল, (৩) বিচ্ছু, (৪) ইঁদুর, (৫) হিংস্র কুকুর।"[৭২]

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে সহীহ মুসলিমের হাদিসে নবী (ﷺ) বলেন :

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا

অর্থাৎ- "পাঁচটি প্রাণী ক্ষতিকারক। হিল্ল (মীকাত ও হারামের মধ্যবর্তী স্থান) অথবা হারামে যেখানেই পাওয়া যাবে সেগুলো হত্যা করা

---

৭১ বুখারী- হাদীস নং ১৮২৮, মুসলিম- হাদীস নং ১২০০।
৭২ বুখারী- হাদীস নং ১৮২৯, মুসলিম- হাদীস নং ১১৯৮।

যেতে পারে। (১) সাপ, (২) কাক, (৩) ইঁদুর, (৪) হিংস্র কুকুর ও (৫) চিল।”[৭৩]

উল্লেখিত হাদিসসমূহে যে সমস্ত প্রাণীর নাম এসেছে অন্যান্য ক্ষতিকারক প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালিক (রহ.) ‘আল-কাল্‌বুল আকুর’-এর অর্থ করেছেন,

إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَخَافَهُمْ مِثْلُ الأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ

অর্থাৎ-“যে সকল প্রাণী মানুষকে কামড় দেয়, আক্রমণ করে ও ভীতি প্রদর্শন করে যেমন- বাগদাস, চিতাবাঘ, সিংহ ও শিয়াল– এর সবগুলোই হিংস্র পশু হিসেবে বিবেচিত।”[৭৪]

(খ) বৃক্ষ কর্তন, কাটা-ছেঁড়া ইত্যাদি :

এ সমস্ত বিষয় ও মাস আলা সমূহ হারাম নগরীর বৈশিষ্ট্যের অন্ত র্ভুক্ত। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা সম্পর্কে বলেছেন, সেখানকার কাটা ছেঁড়া যাবে না ও তার কোন গাছ কাটা যাবে না। তবে ঘাস কাটা যাবে।

উল্লেখিত হাদিসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, হারাম এলাকার গাছ-গাছালি ও উদ্ভিদ সেটা কাঁটা হলেও কর্তন করা যাবে না। বিধানটি বিশেষভাবে সে সকল উদ্ভিদের সাথে সম্পৃক্ত যেগুলো মানুষের কোন শ্রম ছাড়াই আল্লাহর কুদরতে উৎপন্ন হয়। তাই কুরতুবী (রহ.) বলেন, কর্তন নিষিদ্ধ ঘোষিত বৃক্ষ বলতে ফকীহগণের মতে এখানে ঐ সমস্ত গাছ-পালার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর কুদরতে উৎপাদিত, যেখানে মানুষের কোন শ্রম নেই। তবে মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত বৃক্ষ-লতা কাটা সম্পর্কে ওলামা কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। অধিক সংখ্যকদের মতে এগুলো কর্তন করা যাবে।[৭৫]

---

[৭৩] মুসলিম- হাদীস নং ১১৯৮।
[৭৪] মুয়াত্তা মালিক ২/২ পৃঃ।
[৭৫] ফাত্‌হুল বারী ৪/৫৩ পৃঃ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হারাম এলাকায় আল্লাহর কুদরতে উৎপাদিত কর্তন নিষিদ্ধ গাছ বা লতাপাতা কাটা হলে, এমতাবস্থায় কর্তনকারীর ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তরে বলা যায়;

এক- সকল আলেমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে গাছ বা কাঁটা-কর্তনকারী গুনাহ্গার হবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক হারাম কৃত বিধান লঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হবে।

দুই- নিষিদ্ধ ঘোষিত বৃক্ষ ও লতাপাতা কর্তনকারীর পরিণাম সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মত দিয়েছেন

তাবেঈ আতার (رضي الله عنه) মতে সে ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে তাকে ইস্তি গফার-তাওবা করতে হবে। ইমাম মালিক, ইবনুল মুনযির, আবূ মাউর এবং ইবনে হায্ম মতটি গ্রহণ করেন। তিন ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ি ও আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.)-এর মতে এমন অপরাধীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যাপারে তাদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফার দৃষ্টিতে কর্তনকৃত গাছের বাস্তব মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। যদি সেটার মূল্য একটি কুরবানির পশুর সমপরিমাণ হয় তাহলে তাকে একটি পশু দান করতে হবে। যদি মূল্য তার চেয়ে কম হয় তাহলে সে মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হবে। সেখান থেকে এক একজন মিসকিনকে আধা সা' খাদ্য প্রদান করতে হবে।

তবে ইমাম শাফেয়ি ও আহমাদ (রহ.)-এর মতে কর্তন করা গাছ যদি বড় ধরনের হয় তাহলে একটি গাভি, যদি ছোট বৃক্ষ হয়, তাহলে একটি ছাগল এবং ছোট লতাপাতা বা ঘাস জাতীয় জিনিস হলে তার মূল্য দিতে হবে।

তবে নিম্নের দু'টি মাস আলার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

১- ইবনে কুদামাহ (রহ.) বলেন, ভাঙ্গা ডাল অথবা নিজে নিজে পড়ে যাওয়া পাতা ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই। ইমাম আহমাদ (রহ.) এ রায় দিয়েছেন। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

২- মানুষের কর্তন ছাড়া নীচে পড়ে থাকা পাতা-ঘাস ইত্যাদি রাখাল পশুকে খাওয়াতে পারে। ইমাম মালিক এবং শাফেয়ি (রহ.) এই মত

ব্যক্ত করেছেন। তবে ইমাম আবূ হানিফা এটা ব্যবহার করা বৈধ হবে না বলে মত দিয়েছেন।[৭৬]

(গ) প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে পড়ে থাকা জিনিস উঠানো যাবে না:

বিধানটি মক্কার আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (ﷺ) শহরের সর্বত্র পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। সেটা হল প্রাপক যেন এক বছর পর্যন্ত বিষয়টি প্রচার করতে থাকে। অতঃপর কোন মালিকের সন্ধান না পেলে প্রাপক নিজে সেটা ব্যবহার করতে পারবে। যায়েদ ইবনে খালেদ (رضي الله عنه)-এর হাদিস হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রাপ্য বস্তুর হুকুম জানার উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট হাজির হয়। তিনি লোকটিকে বললেন, প্রাপ্য জিনিসের ধরন ও প্রকৃতি জানিয়ে দাও এবং এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে থাক। এর মধ্যে আসল মালিক পাওয়া গেলে ভাল কথা, (তার জিনিস তাকে দিয়ে দেবে) আর যদি না পাওয়া যায় তবে সেটা তুমি ব্যবহার করতে পার। লোকটি প্রশ্ন করল, হারিয়ে যাওয়া ছাগলের কি হবে? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের, অথবা বাঘের হবে। লোকটি বলল, হারিয়ে যাওয়া উটের কি হবে? তিনি বললেন, এ বিষয়ে তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, প্রাণীটির সাথে খাদ্য রয়েছে। চলার গতি রয়েছে। সে তার মালিককে পাওয়া পর্যন্ত পানি পান করে ঘাস খেয়ে চরে বেড়াবে।[৭৭]

এটা হচ্ছে যে কোন স্থানে প্রাপ্য বস্তু সম্পর্কিত হুকুম বা বিধান। তবে মক্কা নগরীতে প্রাপ্য বস্তুর হুকুম কি, সে ব্যাপারে কোন কোন আলেমের মত হল, অন্যত্র প্রাপ্য জিনিসের যে হুকুম, এখানেও একই হুকুম। তবে প্রাপ্য জিনিসের প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এই মতাবলম্বীদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মালিক ও আবূ হানিফা। এটি ইমাম আহমাদ-এর একটি মত। তবে কিছু আলেমের মত হল, মালিকানা লাভের উদ্দেশে নয়, শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশে নেয়া যেতে পারে। এ মত

---

[৭৬] আল্-মুগনী ৩/৩৬৫-৩৬৬ পৃঃ।

[৭৭] বুখারী- হাদীস নং ২৪২৭।

ব্যক্ত করেছেন ইমাম শাফেয়ি এবং আবদুর রহমান ইবনে মাহদী। ইমাম আহমাদ হতে অনুরূপ একটি মত বর্ণিত।[৭৮]

এর মধ্যে দ্বিতীয় মতটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ হল, মক্কা তথা হারাম এলাকায় পড়ে থাকা কোন কিছু উঠানো জায়েয নেই। তবে এক দু'বছর পর মালিকানা প্রাপ্ত হবে এমনটি আশা না করে শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশে কুড়ানো যেতে পারে। কারণ, হাদিস বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য, 'বিজ্ঞাপক ছাড়া অন্য কেউ মক্কার পথে-ঘাটে পড়ে থাকা কোন কিছু তুলতে পারবে না'। হারাম শরীফের বিশেষ বিশেষ হুকুম বর্ণনার ধারাবাহিকতায় বলা হয়েছে। যেমন শিকার করা ও বৃক্ষ-লতা কর্তন হারাম। যদি হারামের সীমানায় এবং হারামের বাইরে পড়ে থাকা বস্তুর হুকুম সমান হয় তাহলে তো বিশেষভাবে এটি বর্ণনার কোন অর্থ থাকে না।

শেষোক্ত মত মতটি গ্রহণ করেছেন ইমাম নববী এবং হাফেয ইবনে হাজার (রহ.)। তিনি বলেন, এ হাদিসের অর্থ হল, পড়ে থাকা জিনিস উঠানো যাবে যদি কেবল প্রচারের উদ্দেশে হয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয়, কিছুদিন প্রচার করব, এরপর মালিক হব, তাহলে কুড়ানো জায়েয নয়। ইবনে হাজার (রহ.) আরো বলেন। ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদিস প্রমাণ করছে যে, মক্কা নগরীতে পড়ে থাকা কোন জিনিস মালিকানা লাভের জন্য কুড়ানো যাবে না। শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশে তোলা যাবে।[৭৯]

শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায (রহ.)-কে একজন প্রশ্ন করেন যে, হারামে পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি? এ ধরনের বস্তু ফকিরকে দান করা কি জায়েয? অথবা সেটা কি মসজিদ নির্মাণ কাজে খরচ করা বৈধ হবে?

---

৭৮ বিদায়াতুল মুজতাহিদ ৪/১১০ পৃঃ, আল-মুগ্‌নী ৮/৩০৫ পৃঃ।

৭৯ ফাত্‌হুল বারী ৫/১০৬ পৃঃ।

উত্তরে তিনি বলেন, হারাম শরীফে কুড়িয়ে পাওয়া কোন বস্তু মাসজিদের কাজে দান করবে না, কোন ফকিরকেও দেবে না। বরং সর্বদা জনসমাবেশে এ বলে প্রচার করতে থাকবে, কে দিনার হারিয়েছে? কে দিরহাম হারিয়েছে? কে স্বর্ণ হারিয়েছে? .... কেননা নবী (ﷺ) বলেছেন, পড়ে থাকা জিনিস প্রচারক ব্যতীত আর কেউ কুড়াতে পারবে না। যিনি বিষয়টি সম্পর্কে ঘোষণা দেবেন তিনিই প্রচারক। একই হুকুম মদিনা শরীফের ক্ষেত্রেও। পড়ে থাকা জিনিসটি সে স্থানেই পড়ে থাকতে দেয়া হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ সেটা যদি দেশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাছে শপে দেয়া হয় তাহলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

১২. বিনা এহরামে মক্কায় প্রবেশের হুকুম :

উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হজ বা উমরার উদ্দেশে আগমনকারী কেউ বিনা এহরামে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। তবে প্রয়োজনবশত বার বার যাদেরকে মক্কা যেতে হয়, অথবা হজ বা ওমরা ছাড়া অন্য উদ্দেশে মক্কায় এসেছে, অথবা যারা মক্কা নগরীতে স্থায়ী বসবাস করে– তাদের জন্য সহীহ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশের সময় এহরাম জরুরী নয়।

ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে একটি পৃথক অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন "হারাম শরীফ ও মক্কায় বিনা এহরামে প্রবেশ"। ইবনে উমার এহরামে মক্কা প্রবেশ করেন। নবী (ﷺ) এহরাম বেঁধে তালবিয়া বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কেবল যারা হজ বা ওমরা করতে ইচ্ছুক। অন্যদের সম্পর্কে তিনি এরূপ নির্দেশ দেননি।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, সারমর্ম হচ্ছে যে, কেবল হজ বা উমরাকারীদের জন্য এহরাম জরুরি। প্রমাণ হিসেবে তিনি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর হাদিস উল্লেখ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, "কেবল হজ ও উমরার নিয়াতকারীদের।" এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজ ও উমরা ব্যতীত যারা বার বার মক্কা যাতায়াত করবে তাদের জন্য এহরাম বাঁধা জরুরি নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র নগরীর সম্মানিত স্থানসমূহ :

এ পবিত্র নগরীর অপরিসীম মর্যাদা ও সম্মানের পাশাপাশি। এতে রয়েছে অসংখ্য পবিত্র, বরকতপূর্ণ ও সম্মানিত স্থান ও নিদর্শন যা তার সম্মান ও মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কুরআনের বহু আয়াত ও রাসূল (ﷺ)-এর অসংখ্য হাদিস রয়েছে যা ঐ মুবারক স্থানসমূহের মাহাত্ম্য ও বিধি-বিধান বর্ণনা করে এবং ঐ স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার সঠিক পন্থা বর্ণনা করে। সম্মান প্রদর্শনের নামে যা লঙ্ঘন করা বৈধ নয় তাও এগুলো বর্ণনা করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো :

প্রথমত : কা'বা শরীফ ও এর কিছু বিধি-বিধান :

কা'বা হচ্ছে পবিত্র আল্লাহর ঘর, যা মাসজিদের মাঝখানে অবস্থিত। এর আকৃতি চতুর্ভুজ। এর দরজা মাটি থেকে কিছু উপরে। চতুষ্কোণ হওয়ার কারণে কা'বা বলে এর নামকরণ করা হয়েছে।[৮০]

الكعبة (আল-কা'বা) শব্দটি হুবহু এই নামে আল-কুরআনে এসেছে।

যেমন :

﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ ﴿المائدة:٩٧﴾

"মহা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণ-কর্ম নির্বাহের উপায় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন ।"[৮১]

---

৮০ আল-মাজমু' আল-মুগীস ঃ ৫২/৩

৮১ আল-মায়িদাহ ঃ ৯৭

তার অন্য নামের মধ্যে রয়েছে الْبَيْتُ (আল-বাইত)।

আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿البقرة:١٢٧﴾

“স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কা‘বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দু‘আ করেছিল : পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।”[৮২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) এরশাদ করেন :

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿الحج:٢٦﴾

“যখন আমি ইবরাহীমকে বাইতুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওয়াফকারীদের জন্যে, নামাজে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকু-সিজাকারীদের জন্যে।”[৮৩]

কা‘বার আরেকটি নাম হচ্ছে : الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (আল-বাইতুল ‘আতিক)

যেমন এরশাদ হচ্ছে :

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿الحج:٢٩﴾

“এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানৎ পূর্ণ করে এবং এ পুরাতন গৃহের তওয়াফ করে।”[৮৪]

---

[৮২] আল-বাক্বারাহ ঃ ১২৭

[৮৩] আল-হাজ্জ ঃ ২৬

[৮৪] হাজ্জ ঃ ২৯

সুতরাং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বুঝা গেল, কা‘বা হচ্ছে : আল-বাইছিল হারাম (সম্মানিত ঘর) এবং আল-বাইতুল ‘আতিক (সু সংরক্ষিত গৃহ)।

ইতিপূর্বে আল্লাহ (ﷻ) উল্লেখ করেন যে, ইবরাহীম খলিলুল্লাহই বাইতুল্লাহর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং কা‘বা গৃহ নির্মাণ করেন এবং এ কাজে তাঁর পুত্র ইসমাইল (আলাইহি সালাম) তাঁকে সহযোগিতা করেন।

আল্লাহ (ﷻ) কা‘বাগৃহের মর্যাদা এত বেশি নির্ধারণ করেন যা এ পৃথিবীর বুকে অন্য কোন স্থানের জন্য নির্ধারণ করেননি। পবিত্র আল্লাহর ঘর কা‘বা সম্পর্কিত কিছু বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন নিম্নে দেওয়া হলো:

১. তওয়াফ : কা‘বা গৃহ ছাড়া এ পৃথিবীর কোন গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার অনুমতি আল্লাহ (ﷻ) দেননি। এ তাওয়াফকে সর্বোত্তম কাজ আখ্যা দিয়ে কুরআনে তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন :

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿الحج:٢٩﴾

“তারা যেন সু সংরক্ষিত গৃহের তওয়াফ করে।”[৮৫]

পবিত্র ঘর কা‘বাকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সিজাকারীদের জন্য পবিত্র করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর খলিল ইবরাহীম ও স্বীয় পুত্র ইসমাইল (আঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন, যা আল-কুরআনে এভাবে এসেছে :

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿البقرة:١٢٥﴾

“এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ)-কে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সিজাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ।”[৮৬]

---

[৮৫] সূরা হাজ্জ ঃ ২৯

আল্লাহ (ﷻ) কা'বার চতুষ্পার্শ্বে তওয়াফ তথা প্রদক্ষিণ করাকে প্রত্যেক হাজী এবং 'উমরাকারীর জন্য রুকন তথা ফরজ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং কা'বাগৃহের তওয়াফ ছাড়া হজ বা 'ওমরাহ বিশুদ্ধ হবে না। এমনকি হজ ও 'ওমরাহ ছাড়াও এ গৃহের তওয়াফকে তিনি বিশেষ সাওয়াবের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সেই যে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তাওয়াফ করল না।

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বলেন, "আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ.

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি (কা'বা গৃহের) সাত চক্কর তাওয়াফ করবে সে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার ছাওয়াব পাবে।"[৮৭]

'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (رضي الله عنه) থেকে এ মর্মে আরেকটি হাদিস বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন:

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةٍ.

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করবে। আল্লাহ (ﷻ) তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি নেকি লিখবেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।"[৮৮]

---

[৮৬] সূরা আল-বাক্বারা ঃ ১২৫।

[৮৭] সুনান আন-নাসায়ী ঃ ২২১/৫, আলবানী উক্ত হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীস নং- ২৭৩২।

[৮৮] তিরমিযী ৯৫৯; আল-হাকিম ৪৮৯/১; ইবনে খুযাইমা ২৭৫৩; সহীহ ইবনে হিব্বান ৩৬৯৭; উপরোল্লিখিত হাদীসের সনদে 'আতা ইবনে সায়িব নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। কারণ শেষ জীবনে তার স্মৃতির বিভ্রম দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস সুফিয়ান ইবনে 'উয়াইনার সনদে 'আতা ইবনে সায়িব থেকে

অনুরূপভাবে যে হাজী মক্কা ছেড়ে স্বদেশের দিকে যাত্রা করতে চায় রাসূল (ﷺ) তার উপর কা'বাগৃহের বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব করেছেন। ইমাম বুখারি তাঁর রচিত সহীহ বুখারিতে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন :

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ.

"রাসূল (ﷺ) ঋতুবতী মহিলা ছাড়া অন্য সকল হাজীকে মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৮৯]

অপর বর্ণনায় ইমাম মুসলিম 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : "মানুষ হজের কাজ সম্পাদন করার পর চতুর্দিকে চলে যাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (ﷺ) বললেন :

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِه بِالْبَيْتِ.

"সর্বশেষ আমল হিসেবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ না করে কেউ যেন মক্কা ত্যাগ না করে ।"[৯০]

শরিয়ত প্রণেতা কা'বা গৃহের তওয়াফকারীদেরকে যখন ইচ্ছা তওয়াফ করা থেকে বারণ করতে নিষেধ করেছেন। যুবায়ের ইবনে মুত্'য়িম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেন :

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

উল্লেখ করেছেন– (মুসনাদে আহমাদ ১১/২)। আর সুফিয়ান 'আতা থেকে উক্ত হাদীস তাঁর স্মৃতির বিভ্রমের পূর্বেই বর্ণনা করেন। ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ একটি হাদীস সুফিয়ান সাওরী থেকে বর্ণনা করেন– (সহীহ হিব্বান ১২/৯)। সুতরাং উল্লেখিত হাদীসটি এ ধরনের অনুগামী সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীস দ্বারা শক্তিশালী হয়েচে। কারণ সুফিয়ান ইবনে 'উয়াইনা ও সুফিয়ান সাওরী উভয়ই 'আতা থেকে তাঁর স্মৃতির বিভ্রমের পূর্বে বর্ণনা করেছেন। (আল-আলবানী, আল-সিল্‌সিলাতুস সাহীহা ৪৯৭/৬)

[৮৯] সহীহ বুখারী- হাজ্জ অধ্যায়ের তওয়াফুল বিদা'র অনুচ্ছেদ, হাদীস নং- ১৭৫৫।

[৯০] সহীহ মুসলিম- হাজ্জ অধ্যায়ের ওজুবু তাওয়াফিল বিদা'র অনুচ্ছে, হাদীস নং- ১৩২৭।

“হে বনী আবদে মানাফ! দিবা-রাত্রির যে কোন সময় কা‘বা গৃহের তওয়াফ বা সালাত আদায়ে কাউকে বাধা দিয়ো না।”[৯১]

২. কা‘বা শরীফ জীবিত ও মৃত মানুষের কিব্লা :

আল্লাহ (ﷻ) কা‘বা ঘরকে মুসলিমদের কিবলা নির্ধারণ করেছেন, তারা সালাত আদায়ের সময় সেদিকে মুখ করবে। তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দেন :

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[البقرة:١٤٤]

“সুতরাং আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন।”[৯২]

ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ গ্রন্থে এ মর্মে ইবনে ‘আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

অর্থাৎ- “রাসূল (ﷺ) কা‘বামুখী হয়ে দু’রাকাত‘আত সালাত আদায় করে বলেন : এটাই কিবলা।”[৯৩]

ইমাম নাসায়ী উসামা ইবনে যায়দ থেকে বর্ণনা করেন : রাসূল (ﷺ) কা‘বার ভিতর থেকে বের হলেন এবং কা‘বামুখী হয়ে দু’রাকাত‘আত সালাত পড়ে বললেন : এটাই কিবলা, এটাই কিবলা।”[৯৪]

---

[৯১] আবূ দাঊদ- হাঃ নং- ১৮৯৪; তিরমিযী ৮৬৮, তিনি এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন; নাসায়ী- হাঃ নং- ২৮৪/১, ২২৩/৫; ইবনে মাজাহ- হাঃ নং- ১২৫৪; ইবনে খুযাইমা- হাঃ নং- ২৭৪৭; সহীহ ইবনে হিব্বান- হাঃ নং- ১৫৫২; হাকিম- হাঃ নং- ৪৪৮/১, তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

[৯২] সূরা বাক্বারা ঃ ১৪৪।

[৯৩] সহীহ বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী, “আর তোমরা ইবরাহীমর দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের জায়গা বানাও।” (সূরা বাকারা ১২৫), হাদীস নং- ৩৯৮।

সুতরাং কা'বার চতুর্দিকই কিবলা। অতএব যে ব্যক্তি কা'বা দেখতে পায়, তার জন্য কা'বামুখী হওয়া ছাড়া সালাত হবে না। যখন কোন ব্যক্তি ভিন্নমুখী হয়ে সালাত আদায় করবে, তার পুরো সালাতগুলো পুনরায় পড়তে হবে। আর যে ব্যক্তি কা'বা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে, তাকে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হবে।[৯৫]

মুসাফিরের নফল সালাতের ক্ষেত্রে নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। সওয়ারি যেদিকে যায় সেদিকে মুখ করেই সে সালাত আদায় করবে। উম্মতের জন্য সহজ করার উদ্দেশে রাসূল (ﷺ) এ ব্যবস্থা করেছেন। জাবির (رضي الله عنه) বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

অর্থাৎ- "রাসূল (ﷺ) সওয়ারীর উপর সওয়ারি যেদিকে যায় সেদিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করতেন। আর যখন ফরজ সালাত আদায়ের ইচ্ছে করতেন, তখন সওয়ারি থেকে নেমে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতেন।"[৯৬]

জীবদ্দশায় সালাতে মুসলমানদের কিবলা যেমন কা'বা, মৃতের জন্যও কা'বা শরীফ হলো তার কিবলা। কবিরা গুনাহর বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত মাওকুফ হাদিসে এসেছে : "তোমাদের জীবিত

---

৯৪ সুনানুল নাসায়ী ঃ ২২০/৫, আলবানী বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। সহীহ সুনানুল নাসায়ী, হাঃ নং- ২৭২৮। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফুল বিদা' ওয়াজিব হওয়া এবং এ হুকুম ঋতুবতী থেকে রহিত হওয়া, হাদীস নং- ১৩৩০।

৯৫ এ মতটি কুরতুবী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কুরতুবীর এই ব্যাখ্যায় আলিমদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। (১৬০/২)

৯৬ ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসটি তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হওয়া, হাঃ নং- ৪০০।

ও মৃতের কিবলা বাইছিল হারাম (কা'বা)-এ গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।"[৯৭] মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার ডান কাতে শোয়ানো হয়। তার চেহারাকে কিবলামুখী রাখা হয়। তার মাথা কিবলার ডান পার্শ্বে এবং পা দ্বয় কিবলার বাম পার্শ্বে। রাসূল (ﷺ) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুসলিমদের কর্ম এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের কবরের দৃশ্য এটাই।[৯৮]

৩. টয়লেট সারার সময় কিবলামুখী হওয়া অথবা কিবলাকে পশ্চাৎ রেখে বসার উপর নিষেধাজ্ঞা :

কা'বা গৃহের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূল (ﷺ) টয়লেট সারার সময় কা'বা ও কিবলামুখী হওয়া বা তাকে পশ্চাৎ রেখে বসা থেকে নিষেধ করেছেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবূ আইউব আল-আনসারী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেন :

إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى.

অর্থাৎ- "যখন তোমরা টয়লেটে যাবে (তথা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবে) তখন কিবলামুখী অথবা কিবলাকে পিছ দিয়ে বসবে না। বরং তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে। আবূ আইউব বলেন : আমরা যখন শাম দেশে আসলাম, তখন দেখতে পেলাম সেখানকার

---

[৯৭] উক্ত হাদীসের উৎস নির্ধারণ পূর্বে হয়েছে। মূল বইয়ের ৩৩ নং পৃষ্ঠায়।

[৯৮] ইবনে হাযম, আল-মুহাল্লা ঃ ১৭৩/৫।

টয়লেটগুলোকে কিবলামুখী করে তৈরি করা হয়েছে। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসলাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।"[৯৯]

ইমাম মুসলিম সালমান ফারসি (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাকে প্রশ্ন করা হলো :

قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

অর্থাৎ- "তোমাদের নবী তোমাদেরকে সকল কিছু শিখিয়েছেন এমনকি টয়লেট কীভাবে সারতে হয়, তাও শিক্ষা দিয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন কিবলামুখী হয়ে পায়খানা ও প্রস্রাব করা থেকে বা ডান হাতে শৌচ করা ঢিলা ব্যবহার করা থেকে বা তিন থেকে কম পাথর দিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা থেকে বা গোবর বা হাড় দিয়ে ঢিলা নেয়া থেকে।"[১০০]

উপরে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পায়খানা ও প্রস্রাব করার সময় কিবলামুখী হওয়া বা কিবলাকে পিছনে রেখে বসা কোন অবস্থাতে বৈধ নয়। এটা বাসাবাড়ীতে হোক অথবা খোলা মাঠে হোক। কিন্তু কিছু হাদিস এমনও আছে যার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বাসা-বাড়ির ক্ষেত্রে নয়। বুখারি ও মুসলিম 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন :

---

৯৯ সহীহ বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ মাদীনাহ, শাম ও প্রাচ্যবাসীদের কিবলা, হাদীস নং- ৩৯৪; সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া, হাদীস নং- ২৬৪।

১০০ সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, হাদীস নং- ২৬২।

إِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ : إِذَا قَعَدْتَ على حَاجَتك فلا تستقبل الْقِبْلَةِ وَلاَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

قَالَ عَبْدُ اللهِ وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا

عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

অর্থাৎ- "মানুষ এ কথা বলাবলি করে, যখন তুমি পায়খানা-প্রস্রাব করতে বস, তখন তুমি কিবলা বা বাইতুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে বস না। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন : একদা আমি আমাদের ঘরের উপর উঠে দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'টি ইটের উপরে বসে বাইতুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছেন।[১০১]

ইমাম মুসলিম ইবনে 'উমার (রাঃ) থেকে অনুরূপ আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا

لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

অর্থাৎ- "একদা আমি আমার বোন হাফসার ঘরের উপরে ছাদে উঠে দেখতে পেলাম যে, রাসূল (ﷺ) কিবলাকে পিছন দিয়ে শামদেশমুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার দেয়ার জন্য বসেছেন।"[১০২]

হাদিসের এ উভয় বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে 'উলামায়ে কিরাম ভিন্ন ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অধিকাংশ আলিমের বক্তব্য হচ্ছে: এ নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠ এবং মরুভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বাসাবাড়ীর ক্ষেত্রে নয়। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন : এ অভিমতটি

---

১০১ সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম- অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া, হাদীস নং- ২৬৬।

১০২ সহীহ মুসলিম- অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, হাদীস নং- ২৬৬।

সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য; কারণ এর মাধ্যমে সকল হাদিসের উপর 'আমল করা সম্ভব।১০৩

৪. সুযোগ হলে কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা মুস্তাহাব :

কাউকে কষ্ট না দিয়ে সুযোগ হলে কা'বা শরীফের অভ্যন্তর সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূল (ﷺ) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা গৃহে প্রবেশ করে দু' রাকাত'আত সালাত আদায় করেছেন। ইমাম বুখারি সালিম হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلاَلًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

অর্থাৎ- "রাসূল (ﷺ), উসামা ইবনে যায়দ, বিলাল ও 'উসমান ইবনে তালহা কা'বা গৃহে প্রবেশ করার পর দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর

---

১০৩ ফতহুল বারী ঃ ২৯৬/১, উল্লেখিত বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম মত হচ্ছে দু'টি ঃ

১। সর্বাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা। এটি আবূ আইউব, আবূ হুরাইরাহ, ইবনে মাস'ঊদ, মুজাহিদ, আন-নাখ্য়ী, আস্-সাওরী, 'আতা, আওযায়ী প্রমুখ এর অভিমত। দ্রষ্টব্য ঃ আল-আউসাত ঃ ৩২৫-৩২৬/১; আত্-তামহীদ ঃ ৩০৯/১; শরহুস সুন্নাহ ঃ ৩৫৮/১, আল-মুহাল্লা ঃ ১৯৪/১। উপরোক্ত মতটি হানাফীদের। দ্রষ্টব্য ঃ হাশিয়াতু ইবনে 'আবেদীন ঃ ৩৪১/১; আল-'আরিদা গ্রন্থে ইবনুল 'আরাবী উক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন– (২৭/১)। ইমাম আহমাদ থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তাসহীহুল ফুরু' ঃ ১১১/১। এটি ইবনে হাযমের পছন্দসই মত। আল-মুহাল্লা ১৯৩/১। এটি শায়খুল ইসলাম-এর বাছাইকৃত মত। আল-ইযতিয়ারাতুল 'ইল্মিয়া পৃঃ ১৫, ইবনুল কায়্যিম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে এ অভিমতের স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। (৪৯/১)

২। দ্বিতীয়পক্ষ খোলামাঠ ও বাসাবাড়ীর মাঝে পার্থক্য করে বলেন ঃ বাসা-বাড়ীর মাঝে এটা বৈধ এবং খোলামাঠ এবং মরুভূমির ক্ষেত্রে অবৈধ। এটি ইমাম মালিকের অভিমত। দ্রষ্টব্য ঃ আর-মুদাউওয়ানা ঃ ১১৭/১; আত্-তামহীদ ঃ ৩৯০/১; এটা ইমাম শাফিঈর অভিমত। দ্রষ্টব্য ঃ আল-উম্ম ঃ ১৭৬/১, আল-মাজমু' ঃ ৯২/১। এটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল-এর প্রসিদ্ধ মত। দ্রষ্টব্য ঃ আল-মুগনী ঃ ১০৭/১; আল-ইনসাফ ঃ ১০০/১। এটা ইমাম বুখারী ও ইবনে হাজার আসকালানীরও মত। আল-ফাত্হ ঃ ২৯৬/১।

যখন দরজা খুলে দেয়া হয়, তখন সর্বপ্রথম আমি কা'বা গৃহে প্রবেশ করি। সেখানে বিলালের সাথে সাক্ষাতে জিজ্ঞেস করলাম : রাসূল (ﷺ) কি সেখানে সালাত আদায় করেছেন? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি ইয়ামেনী দুই স্তম্ভের মাঝামাঝি স্থানে সালাত আদায় করেছেন।"[১০৪]

ইবনে 'উমারের ক্রীতদাস নাফি' উল্লেখ করেন যে, যে কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য সেখানে যে কোন দিকে ফিরে সালাত আদায় শুদ্ধ।[১০৫]

উপরের বর্ণনা নফল সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ফরজ সালাত আদায় বৈধ কিনা, তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[১০৬] উল্লেখ্য হাতীমে কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে সালাত আদায়ের সমতুল্য। কারণ এটা কা'বারই অংশ। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

৫. কা'বার শেষ পরিণতি :

আল্লাহ (ﷻ) আল-কুরআনে এবং রাসূল (ﷺ) আল-হাদিসে কেয়ামত সম্পর্কে মানুষদেরকে অবহিত করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) ক্বিয়ামাতের উল্লেখযোগ্য কিছু নিদর্শন নির্ধারণ করেছেন, যা রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে অবহিত করেছেন। ক্বিয়ামাতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে : কাবা শরীফকে ধ্বংস করা ও ভেঙে চুড় মার করে ফেলা, যা পুনরায় আর কখনো নির্মিত হবে না। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন পৃথিবীতে আল্লাহ, আল্লাহ (আল্লাহর নাম) বলার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

---

[১০৪] সহীহ বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা গৃহকে বন্ধ করে দেয়া এবং কা'বার যে কোন পানে সালাত আদায় করা, হাঃ নং- **১৫৯৮**। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজী বা সাধারণ মানুষ কা'বা গৃহে প্রবেশ এবং তার যে কোন পার্শ্বে সালাত ও দু'আ করা প্রসঙ্গে, হাঃ নং- **১৩২৯**।

[১০৫] সহীহ বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭, হাঃ নং- ৫০৬।

[১০৬] ফতহুল বারী ঃ ৪৬৬-৪৬৭/৩।

বুখারি ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থ দ্বয়ে আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে, তিনি রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ.

অর্থাৎ- "কা'বা শরীফকে হাবাশার ছোট গোড়ালি বিশিষ্ট লোকজন ধ্বংস করবে।"[১০৭]

ঐ যুগ পাওয়া (আগমন পর্যন্ত বেঁচে থাকা) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দ্বিতীয়ত: কাল পাথর (আল্-হাজারুল আসওয়াদ)

আল্-হাজারুল আসওয়াদ হচ্ছে ঐ পাথর যা আল্লাহর ঘরের পূর্বদিকে বসানো হয়েছে। ঐ বরাবর থেকে কা'বা গৃহের তওয়াফ শুরু হয়। নিরাপদ হারাম শরীফে এটা আল্লাহর স্পষ্ট নিদর্শনসমূহের অন্যতম। নিম্নে এ পাথরের মর্যাদা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিষ্টা চার ও বিধি-বিধান প্রদত্ত হলো :

১. হাজরে আসওয়াদের আগমন জান্নাত হতে :

শরঈ দলিল-প্রমাণ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) জান্নাত থেকে এসেছে। এটা দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিল। কিন্তু বাণী আদমের গুনাহ এটাকে কালো করে ফেলেছে। নিম্নে এ বক্তব্যের স্বপক্ষে হাদিস প্রদত্ত হলো :

ইমাম নাসায়ী তাঁর গ্রন্থ সুনানে নাসায়ীতে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেন :

الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ- "হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে এসেছে।"[১০৮]

---

[১০৭] সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ কা'বাকে ইবনেষ্ট করা, হাঃ নং- ১৫৯৫। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ ফিৎনা ও ক্বিয়ামাতের নিদর্শনসমূহ, হাঃ নং- ২৯০৯।

ইমাম তিরমিযী সুনানে তিরমিযীতে ইবনে 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন :

نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ.

অর্থাৎ- "হাজরে আসওয়াদ জান্নাত হতে অবতরণ করেছে। এটি দুধের চেয়েও শুভ্র ছিল। বাণী আদমের গুনাহ এটাকে কালো করে দিয়েছে।"

নির্জীব বস্তুর উপর গুনাহের প্রভাব যদি এমনটি হয়, তাহলে অন্তরে তার প্রভাব কেমন হতে পারে?

২. হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন ও স্পর্শ করা এবং তার প্রতি মাথা অবনত করা।

হাজরে আসওয়াদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বৈধ পন্থা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কা'বা গৃহের তওয়াফ করতে চায়, সে হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবে। সুন্নাত হচ্ছে সম্ভব হলে পাথরকে চুমু দেয়া। অন্যথায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে, হাতকে চুমু দেবে। যদি এটা সম্ভব না হয় তবে লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে, লাঠিকে চুমু দেবে। যদি সরাসরি চুম্বন বা স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, অথবা চুম্বন ব স্পর্শ করতে গেলে অন্যদের কষ্ট দেয়ার ভয় থাকে, তবে হাত দিয়ে ইশারা করবে। সরাসরি চুম্বন, স্পর্শ বা ইঙ্গিত করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে, নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস প্রদত্ত হলো :

ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ বুখারিতে যুবায়র ইবনে 'আরাবী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

---

[১০৮] সুনানুন নাসায়ী ঃ ২২৬/৫, আলবানী উক্ত হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সহীহ সুনানুন নাসায়ী, হাঃ নং- ২৭৪৮।

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

অর্থাৎ- 'জনৈক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন : আমি রাসূল (ﷺ)-কে এটা স্পর্শ করতে ও চুমু দিতে দেখছি। যুবায়র ইবনে 'আরবি বলেন, আমি ইবনে 'উমারকে জিজ্ঞেস করলাম, যদি সেখানে প্রচণ্ড ভিড় থাকে? যদি অন্য কোন কারণে অপারগ হয়ে পড়ি, তখন কি করব? উত্তরে তিনি বললেন : এ ধরনের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। (এ ধরনের সমস্যা নাও হতে পারে।) আমি রাসূল (ﷺ)-কে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে এবং চুমু খেতে দেখেছি।"[১০৯]

ইমাম মুসলিম নাফে থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

"আমি ইবনে উমারকে হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে, অতঃপর চুমু খেতে দেখেছি। তিনি বলেন : আমি যখন থেকে রাসূল (ﷺ)-কে এ কাজ করতে দেখেছি, তখন থেকে আমি উক্ত কাজটি বর্জন করিনি।"[১১০]

ইমাম মুসলিম আবু তুফায়ল (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

---

১০৯ উক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী সহীহ হিসাবে বর্ণনা করেছেন– হাঃ নং- ৮৭৭। সহীহ ইবনে খুযাইমা ঃ ২১৯০২২০/৪; আলবানী এই হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সহীহ তিরমিযী, হাঃ নং- ৬৯৪।

১১০ সহীহ বুখারী- অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা, হাদীস নং- ১৬১১।

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

"আমি রাসূল (ﷺ)-কে কা'বা শরীফের তওয়াফ, তার নিকট রক্ষিত ছড়ির মাধ্যমে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ, অতঃপর ছড়ি (লাঠি)-কে চুম্বন করতে দেখেছি।"[১১১]

ইমাম বুখারি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.

"নবী (ﷺ) উটের উপর আরোহণ করে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন। যখনই তিনি রুকন তথা হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসতেন, তাঁর কাছে যা-ই থাকত, তা দিয়ে তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করতেন ও 'আল্লাহ আকবার' বলে তাকবীর দিতেন।"[১১২]

ইমাম মুসলিম সুয়াইদ ইবনে ঘাপলা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا.

"আমি 'উমার ফারূক (رضي الله عنه)-কে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে ও তার সাথে লেগে থাকতে দেখেছি এবং তাকে বলতে শুনেছি, হে

---

[১১১] সহীহ মুসলিম- অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ তওয়াফে শুধু দু'টি রুকনে ইয়ামেনীকে স্পর্শ করা মুস্তাহাব, বাকী দু'টি নয়। হাদীস নং- ১২৬৮।

[১১২] সহীহ মুসলিম- অধ্যায় ঃ ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ উট বা এ জাতীয় প্রাণীর উপর আরোহণ করে তওয়াফ করা এবং আরোহীর জন্য ছড়ি বা লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা বৈধ। হাদীস নং- ১২৭৪।

হাজরে আসওয়াদ! আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তোমার সম্মান করতে দেখেছি। (তাই আমিও সম্মান প্রদর্শন করলাম)।"[১১৩]

সহীহ ইবনে খুযাইমাতে জা'ফার ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফারকে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিতে এবং তার তার উপর সিজদা করতে দেখেছি। এরপর তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমি তোমার মামা 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে চুমু দিতে এবং তার উপর সিজদা করতে দেখেছি। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন : আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে হাজরে আসওয়াদ চুমু দিতে এবং তার উপর সিজদা করতে দেখেছি। 'উমার ফারূক (رضي الله عنه) বলেন : আমি রাসূল (ﷺ)-কে এমনটি করতে দেখেছি বলে আমিও করলাম।"[১১৪]

ইমাম ইবনে হুযাইমা উপরোক্ত হাদিসের নিম্নোক্ত শিরোনামে অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন : "অন্য মুসলিমকে কষ্ট না দিয়ে তওয়াফকারী যদি হাজরে আসওয়াদের উপর সিজাদ করতে সক্ষম হয় তাই করবে।"

হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া, স্পর্শ করা এবং এর উপর সিজদা করা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। এসব কিছু বৈধ, সুন্নাত এবং শরিয়তের পক্ষ থেকে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে অনেক ছাওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে। যে এ কাজটি করবে সে একমাত্র রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ এবং প্রতিশ্রুত প্রতিদান প্রাপ্তির আশা করবে। সে এ ধারণা কখনো করবে না যে, এ পাথর তার উপকার বা ক্ষতি করতে পারে, যেমনটা কিছু কিছু অজ্ঞ মানুষ ভেবে থাকে। এজন্যই খলিফাতুল মুসলিমীন 'উমার ফারূক হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার সময় বলেছিলেন :

---

১১৩ সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ বরাবর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করা। হাদীস নং- ১৬১৩।

১১৪ সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ তওয়াফ করার সময় হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া মুস্তাহাব। হাদীস নং- ১২৭০।

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

"(হে হাজরে আসওয়াদ) আমি জানি, তুমি শুধুমাত্র একটি পাথর, মানুষের ক্ষতি বা উপকার কোন কিছুই করার তোমার ক্ষমতা নেই। যদি আমি রাসূল (ﷺ)-কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুমু খেতাম না।"[১১৫]

৩. হাজরে আসওয়াদের স্পর্শ গুনাহকে কমিয়ে দেয় :

ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে উবায়দ ইবনে উমায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, "জনৈক ব্যক্তি ইবনে উমারকে বলেন : হে আবূ 'আবদুর রহমান! তুমি এ দু'টি রুকন ছাড়া অন্য কোন রুকনকে স্পর্শ করছ না, তার পিছনে কি হেতু রয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন :

إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيئَةَ.

"এ দু'টি রুকনের স্পর্শ গুনাহ্ ও পাপ মোচন করে।"[১১৬]

যে ব্যক্তি সততা ও নিষ্ঠার সহিত এ এবাদতটি করবে সে অসংখ্য সাওয়াবের ভাগীদার হবে।

৪. যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে এ পাথরকে স্পর্শ করবে, কেয়ামত দিবসে এ পাথর তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে :

ইমাম হুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে, ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে, হাকিম তার মুসতাদরাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : এ পাথরের জিহ্বা ও দু'ঠোট রয়েছে। যে

---

[১১৫] সহীহ ইবনে খুযাইমা ঃ ২১৩/৪, উক্ত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

[১১৬] সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস নং- ১৫৯৭।

ন্যায়সংগতভাবে এ পাথর স্পর্শ করবে, কেয়ামত দিবসে সে তার পক্ষে সুপারিশ করবে।[১১৭]

সুতরাং হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় তওয়াফকারীদের কষ্ট দেয়া জায়েয নয়। আর যে এ কাজ করবে সে অন্যায়ভাবে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করল। অপরাপর মুসলিমদের কষ্ট ও ক্ষতি করার দরুন সে কোন সাওয়াবই পাবে না। হাদিসে এসেছে যে, নবী (ﷺ) উমার ইবনে খাত্তাবকে এ বলে নির্দেশ দিলেন, "হে 'উমার! তুমি শক্তিশালী ব্যক্তি। তুমি দুর্বলকে কষ্ট দিচ্ছ। যখন তুমি নির্জনতা পাবে, হাজারে আসওয়াদকে চুমু দেবে। অন্যথায় 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে চলে যাবে।[১১৮]

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন : যখন হাজারে আসওয়াদের পার্শ্বে ভিড় পাবে। তখন কাউকে কষ্ট দেবে না এবং নিজেও কষ্ট পাবে না।[১১৯] তিনি আরও বলেন : আমি চাই যে হাজারে আসওয়াদের উপর ভিড় করবে সে যেন নিঃস্ব হয়ে পড়ে।[১২০]

এ নিষেধাজ্ঞাটি মেয়েদের ব্যাপারে আরও প্রবল। বিশেষ করে যখন হাজারে আসওয়াদের পার্শ্বে ভিড় থাকে এবং অপরিচিত পুরুষদের সাথে মিশতে বাধ্য করে। 'আতা ইবনে রাবাহ জনৈকা মহিলাকে ভিড়ের মধ্যে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার চেষ্টারত দেখে চিৎকার দিয়ে বললেন :

---

[১১৭] সুনানুন নাসায়ী ঃ ২২১/৪; মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ ঃ ২২৬/১; মুসতাদরাকুল হাকিম ঃ ৪৫৭/১, হাকীম উক্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার সমর্থন করেছেন। আলবানী একে বিশুদ্ধ বলেছেন। সহীহ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ২৩৮১।

[১১৮] সহীহ ইবনে খুযাইমা ঃ ২২১/৪; মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ ঃ ২২৬/১; মুসতাদরাকুল হাকিম ঃ ৪৫৭/১, হাকীম উক্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী তাঁর সমর্থন করেচেন, আলবানী একে বিশুদ্ধ বলেছেন। সহীহ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ২৩৮১।

[১১৯] 'আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এই হাদীসটি সন্নিবেশিত করেছেন। (৬৫/৫); যারকানী মুয়াত্তার ব্যাখ্যায় উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন ঃ ৪০৭/২; উক্ত হাদীসটি মুরসাল, তার সনদ ভাল। আরনাউত্ব তাঁর তা'লিকুর মুসনাদে এই হাদীসকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন, ৩২১/১।

[১২০] আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। (৩৬/৫)

মেয়েদের হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার কোন অধিকার নেই।[১২১] এ বক্তব্য সে সময়ের জন্য যখন পুরুষদের উপস্থিতি ও ভিড় থাকে।

এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যা করছে তা মোটেও বৈধ নয়। যেমন ইমাম সালাম ফেরাবার পূর্বেই হাজারে আসওয়াদকে চুমু বা স্পর্শ করার জন্য সালাত ছেড়ে দেয়া।

৫. তওয়াফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে হাজারে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকবীর ধ্বনি দেয়া।

তওয়াফের প্রত্যেক চক্করের শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দেবে। এমনকি তওয়াফের শেষ চক্কর শেষে যখন হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসবে তখন তাকবীর ধ্বনি দেবে। পুরো সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করতে তাকবীরের সংখ্যা হবে আট।[১২২]

ইমাম বুখারি তাঁর সহীহুল বুখারিতে 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.

"নবী (ﷺ) উটের উপর আরোহণ করে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করেন। যখন তিনি হাজারে আসওয়াদ বরাবর আসতেন, তখন তিনি তাঁর কাছে যা কিছু থাকত, তা দিয়ে এর প্রতি ইঙ্গিত করতেন এবং তাকবীর ধ্বনি দিতেন।"[১২৩]

কতক উলামায়ে কেরাম সাত তাকবীরকেই যথাযথ মনে করেন (আট তাকবীরকে নয়), কারণ তাকবীর তো তওয়াফের প্রত্যেক চক্করের

---

১২১ প্রাগুক্ত ঃ ৩৩৪/১।

১২২ ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা ঃ ২২৪-২২৫/১১।

১২৩ সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ রুকন ইয়ামিনীর নিকটে তাকবীর দেয়া। হাদীস নং- ১৬১৩।

শুরুতে হবে, শেষে নয়।[১২৪] হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় তাকবীরের ধরন বিসমিল্লাহ সহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। এভাবে বলবে: বিসমিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার।[১২৫]

তৃতীয়তঃ রুকন ইয়া মানী

এটা কা'বা গৃহের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত হচ্ছে : চুমু না দিয়ে শুধু স্পর্শ করা।

নবী (ﷺ) নিজ হাতে এ রুকনটিতে স্পর্শ করতেন। ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

"দু'টি রুকন ইয়া-মানী ছাড়া আমি নবী (ﷺ)-কে অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতে দেখেনি।"[১২৬]

কা'বা ঘরের তওয়াফকারীর পক্ষে প্রত্যেক চক্করে রুকন ইয়া-মানী ও হাজারে আসওয়াদের স্পর্শ করা সম্ভব হয়, তবে এটাই শ্রেয়। হাদিসে এসেছে যে, নবী (ﷺ) যখন বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতেন, তখন প্রত্যেক তওয়াফে হাজারে আসওয়াদ ও রুকন ইয়া মানীকে স্পর্শ করতেন।[১২৭]

চতুর্থত : মুলতাযাম

---

১২৪ ইবনে উসাইমিন, আশ্-শরহুল মুম্তি, শরহু যাদিন মুসতান কি' ঃ ২৮১/৭।

১২৫ বাইহাকী উক্ত হাদীসটি সহীহ সনদে আস্-সুনানুল কুবরাতে বর্ণনা করেছেন। (৭৯/৫)

১২৬ ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসটি হাজ্জ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন। অনুচ্ছেদ ঃ যে দুই রুকন ইয়ামানী ছাড়া অন্য দুই রুকন স্পর্শ করেনি। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ তওয়াফ করার সময় দুই রুকন ইয়ামানীকে স্পর্শ করা মুস্তাহাব, বাকী দুই রুকন নয়। হাদীস নং- ১২৬৭।

১২৭ হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে উক্ত হাদীসটি সহীহ হিসাবে সন্নিবেশিত করেছেন। (৪৫৬/১); যাহাবীও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন, সুনানুল বাইহাকী ঃ ৭৬/৫; মুসনাদ আহমাদ ঃ ১৮/২; আলবানী তার সহীহ হাদীস সংকলনে এ হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আস্-সিলসিলাতুস সাহিহা ঃ ১০৮/৫।

'আবদুর রহমান ইবনে সাফওয়ান বলেন :

فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ مِنْ الْكَعْبَةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ اسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الْحَطِيمِ وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَهُمْ.

"তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাথীদের কা'বা গৃহ হতে বের হতে দেখলেন। অতঃপর তারা কা'বা গৃহের দরজা থেকে নিয়ে হাতীম পর্যন্ত স্পর্শ করলেন এবং তাঁরা তাঁদের গাল বাইতুল্লাহর সাথে লাগিয়ে রাখলেন। রাসূল (ﷺ) তখন তাদের মাঝে ছিলেন।"[১২৮]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'বা গৃহের দরজা এবং রুকনের মাঝামাঝি স্থানটি মুলতাযাম।[১২৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন : কোন ব্যক্তি যদি হাজরে আসওয়াদ এবং কা'বা গৃহের দরজার মাঝামাঝি মুল্‌তাযাম আসতে চায়, তার উচিত সে যেন তার বক্ষ, চেহারা, দুই বাহু ও দুই হাতের তালু মুলতাযামে রেখে দু'আ করে এবং আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন কামনা করে। আর এটা তাওয়াফুল বিদা'র পূর্বেও করা যায়। এ কাজটি বিদায়ি মুহূর্তে বা তার পূর্বে যে কোন সময় করা যায়। রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীরা মক্কা প্রবেশ করার সময় এ কাজটি করতেন।

---

১২৮ সুনানু আবূ দাউদ ঃ ১৮৯৮। এই হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কিন্তু তার অনুরূপ একটি হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র থেকে বর্ণিত। তিনি রুকন এবং দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন। তিনি তার বক্ষ, দু' বাহু ও দু' হাতের তালু সম্প্রসারিত করে কা'বা গৃহের উপর রাখলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূল ﷺ-কে এমনটি করতে দেখেছি। আবূ দাউদ ঃ ১৮৯৯; ইবনে মাজাহ ঃ ১৯৬২। এই হাদীসের সনদ উত্তম।

১২৯ আবদুর রাজ্জাক সানআনী, আল্-মুসান্নাফ ঃ ৭৬/৫, এই হাদীসের সনদ সহীহ। আলবানী তাঁর সহীহ হাদীস সংকলনে এই হাদীসটি সন্নিবেশিত করেছেন। (১৭১/৫)

আর সে ব্যক্তি চাইলে ইবনে আব্বাস (রাযি) থেকে বর্ণিত দু'আও পড়তে পারে। সে দু'আটি হচ্ছে : হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাহ, তোমার বান্দার সন্তান এবং তোমার বাঁদির সন্তান। তুমি আমাকে এখানে তোমার বশীভূত সৃষ্টির উপর বহন করে নিয়ে এসেছ, এবং তুমি তোমার দেশে আমাকে ভ্রমণ করিয়েছ। অবশেষে তোমার নিয়ামতের বদৌলতে তুমি আমাকে তোমার ঘরে পৌঁছেছি এবং হজ করার তৌফিক এনায়েত করেছ।

তুমি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাক, তাহলে আমার প্রতি আরো বেশি সন্তুষ্ট হও। অন্যথায় আমার বাড়ি তোমার ঘর (কা'বা) থেকে দূরবর্তী হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার দেশে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে, যদি তুমি আমাকে অনুমতি দাও। তোমাকে এবং তোমার ঘরকে পরিবর্তন করছি না। আমি তোমার ও তোমার ঘর থেকে বিমুখও নই। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে শারীরিক আরোগ্য ও সুস্থতা দান কর। তুমি আমার দীনকে হিফাযাত কর। তুমি আমার পরিণতি সুন্দর কর। যতদিন এ পৃথিবীতে থাকার সুযোগ দেবে, ততদিন তোমার অনুগত হয়ে থাকার তৌফিক দান কর। তুমি আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান কর, তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।[১৩০]

পঞ্চমত: আল্‌- হিজর

হিজর হচ্ছে কা'বার উত্তরদিকে অবস্থিত অর্ধেক বৃত্তাকার অংশটুকু। এটা কা'বা ঘরের অংশ। অর্থাভাবে কা'বার পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশরা ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে সক্ষম হয়নি। তারা ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভিত্তির স্থানগুলোতে পাথর স্থাপন করল। এজন্য এর নামকরণ হিজর করা হয়েছে। হিজর

---

১৩০ মাজমু' ফাতাওয়া শায়খিল ইসলাম ঃ ১৪২/২৬, এ দু'আটুকু ইমাম শাফিঈ (রহঃ) থেকেও বর্ণিত। বাইহাকী তাঁর সুনানে এই হাদীসটি সন্নিবেশিত করেছেন, ১৬৪/৫। তিনি বলেন ঃ এটি ইমাম শাফিঈ'র বক্তব্য। এ দু'আটি উত্তম।

মানে পাথর স্থাপন করা। ইমাম মুসলিম আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেন :

إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

"তোমার সমাজের লোকেরা কা'বা গৃহ পুনর্নিমাণের সময় একে ছোট করে ফেলেছে। তারা যদি অতি সম্প্রতি শিরক ত্যাগ করে মুসলিম না হতেন তবে যে অংশটুকু তারা বাহিরে রেখেছে সে টুকু আমি কা'বা গৃহের ভিতরে ফেরত নিয়ে আসতাম অর্থাৎ কা'বা গৃহকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতাম। হে আয়েশা! চল, তোমাকে ঐ স্থানটুকু দেখিয়ে দেই যেটুকু কুরায়শরা কা'বাগৃহ পুনর্নিমাণের সময় বাহিরে রেখেছে। এ বলে তিনি বাহিরে থাকা সাত হাত পরিমাণ স্থান দেখিয়ে দিলেন। তোমার সমাজের লোকেরা আমার মৃত্যুর পর যদি পুনরায় একে নির্মাণ করতে চায়, তখন তুমি তাদেরকে এটা দেখিয়ে দেবে।"[১৩১]

রাসূল (ﷺ) যে পরিমাণ স্থান বাহিরে ছিল বলে নির্ধারণ করেছেন সে টুকুই কা'বার অংশ। বর্তমানে উত্তর দিকের দেয়ালের ভিতরে যতটুকু স্থান ঢোকানো হয়েছে, তা সঠিক পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। যে এখানে সালাত আদায় করতে চায়, তার উচিত হাদিসে বর্ণিত সঠিক স্থানটুকু তালাশ করে বের করা।

হিজরি সালাত আদায় করা কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায়ের সমান। কারণ এটা কা'বাগৃহেরই অংশ। আবদুর রাজ্জাক আয়েশা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন :

---

[১৩১] সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ পুনর্মিলনের সময় কা'বাকে ছোট করা। হাঃ নং- ৯৬৮।

كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لِي صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْبَيْتِ.

"আমি কা'বা গৃহে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে আগ্রহ প্রকাশ করতাম। তখন রাসূল (ﷺ) আমরা হাত ধরে হিজ্‌রে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং বললেন : তুমি চাইলে হিজ্‌রে সালাত আদায় করতে পার। কারণ এটা কা'বারই অংশ। কিন্তু তোমার সমাজের লোকেরা কা'বার পুনর্নিমাণের সময় এটাকে ছোট করে ফেলেছে এবং হিজ্‌রকে কা'বার বাইরে রেখে দিয়েছে।"[১৩২]

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, কা'বা ঘরের তওয়াফকারী অবশ্যই হিজ্‌রের বাইরে দিয়ে তওয়াফ করবে। কারণ এটা কা'বারই অংশ। ব্যাপক হারে প্রচারিত ভুলেরই একটি হচ্ছে এটাকে "হিজ্‌র ইসমাইল" করে নামকরণ করা। এ নামকরণটি সঠিক নয়। এর চেয়ে জঘন্যতম হচ্ছে যে, কিছু সাধারণ মানুষ মনে করে যে, ইসমাইল (عليه السلام) অথবা অন্যান্য নবীদেরকে এখানে দাফন করা হয়েছে।

ষষ্ঠত: মাকামে ইব্‌রাহীম

হারাম শরীফের প্রকাশ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মাকামে ইব্‌রাহীম। হাদিসের বর্ণনানুযায়ী মাকামে ইব্‌রাহীম হচ্ছে ঐ পাথর যার উপর দাঁড়িয়ে ইব্‌রাহীম খলিলুল্লাহ কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন যখন এর নির্মাণ কাজ স্বাভাবিকভাবে হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল।

---

১৩২ মুসনাদ আহমাদ ঃ ৯২/৬, সহীহ ইবনে খুযাইমা ঃ হাঃ নং- ৩০১৮, ত্বাহাবী, শরহু মা'আনিল আসার ঃ ৩৯২/১, হাদীসটির সৌন্দর্য সাধনের যোগ্য।

অতঃপর নির্মাণ কাজ শেষে ঐ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি সারা বিশ্বের মানুষকে হজের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৩৩]

ইমাম বুখারির ভাষায় কা'বার নির্মাণ সংক্রান্ত সংবাদ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এতে এসেছে : তারা [ইব্‌রাহীম ও ইসমাইল (عليه السلام)] কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, ইসমাইল পাথর বহন করে নিয়ে আসতেন, আর ইব্‌রাহীম নির্মাণ কাজ করতেন। যখন নির্মাণ কাজ উপরের দিকে উঠতে লাগল, তখন তিনি (ইসমাইল) এ পাথর নিয়ে এসে ইবরাহীমের পার্শ্বে রাখলেন। ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস সালাম) পাথরের উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাইল (عليه السلام) তাঁকে পাথর দিচ্ছিলেন। আর দু'জনেই এ দু'আ পড়ছিলেন:

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾البقرة:١٢٧﴿

"হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ মহৎ কর্মটি) কবুল কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।"[১৩৪]

আল্লাহ (سبحانه وتعالى) আল-কুরআনে মাকামে ইব্‌রাহীমের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাকে হারাম শরীফের স্পষ্ট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে :

﴿فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا ﴾آل عمران:٩٧﴿

"এতে রয়েছে মাকামে ইব্‌রাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভিতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে।[১৩৫]

ইবনে জারির এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে বরকতময় এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ নির্মাণ করা হয়েছে, তা বাক্কায় অবস্থিত, এতে আল্লাহর কুদরতের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে এবং তাঁর বন্ধু ইব্‌রাহীম (عليه السلام)-এর

---

১৩৩ আল্‌-ফাসী শিফাউল গারাম ঃ ২০৩/১।

১৩৪ সূরা আল-বাকারা ১২৭।

১৩৫ সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৭।

নিদর্শন বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটি হলো ঐ পাথরের উপর ইব্‌রাহীম খলিলুল্লাহ পদচিহ্ন, যার উপর (কা'বা নির্মাণের সময়) তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।[১৩৬]

ইবনুল জাওযী বলেন : ইব্‌রাহীম (عليه السلام)-এর পদচিহ্ন এখন পর্যন্ত মাকামে ইব্‌রাহীমে বিদ্যমান। হারাম বাসীদের নিকট এটি খুবই পরিচিত। আবূ তালিব তার প্রসিদ্ধ কাব্যে এ প্রসঙ্গে বলেন :

কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় খালি পায়ে জুতোবিহীন ইব্‌রাহীম খলিলুল্লাহ যে পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিলেন, সেথায় তাঁর দু' পদচিহ্ন এখনও তরতাজা বিদ্যমান।[১৩৭]

মাকামে ইব্‌রাহীমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

(ক) আল্লাহ (سبحانه وتعالى) কা'বাগৃহের তওয়াফকারীকে মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থান বানাবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এরশাদ হচ্ছে :

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ ﴿البقرة:١٢٥﴾

"তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের জায়গা বানাও।"[১৩৮]

ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ বুখারিতে আনাস ও 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেন :

وَافَقْتُ اللهَ فِي ثَلاَثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاَثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى .... الحديث.

---

[১৩৬] তাফসীর ইবনে জারীর তাবারী ঃ ৯/৪। ইবনে হাজার আস্‌কালানী ফাত্‌হুল বারীতে এ বক্তব্যটি ইবনেুল জাওযী থেকে নকল করেছেন। ১৬৯/৮; তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ৩৮৪/১।

[১৩৭] ইবনে হাজার আস্‌কালানী ফাত্‌হুল বারীতে এ বক্তব্যটি ইবনেুল জাওযী থেকে নকল করেছেন। ১৬৯/৮; তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ৩৮৪/১।

[১৩৮] সূরা আল-বাক্বারা ঃ ১২৫।

"তিনটি বিষয়ে আমি আল্লাহ (ﷻ)-র সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছি অথবা আমার প্রভু তিনটি বিষয়ে আমাকে সমর্থন দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতেন.....।"[১৩৯]

তওয়াফের পরে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে সালাত আদায় আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাত। ইমাম নাসাঈ ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

"নবী (ﷺ) কা'বাগৃহে এসে বাইতুল্লায় সাত চক্কর তওয়াফ করেন। মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দু'রাকাত'আত সালাত আদায় করেন এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সা'য়ী করেন।"

তিনি বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿الأحزاب:٢١﴾

"তোমাদের জন্য নবী রাসূলুল্লাহর জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল-আহযাব : ২১)[১৪০]

জাবির (رضي الله عنه) বলেন : ... রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আমরা যখন বাইতুল্লাহতে পৌঁছলাম, তখন তিনি রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে স্পর্শ

---

১৩৯ সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ কিবলা সম্পর্কে এবং যারা মনে করেন, ভুলবশতঃ কেউ যদি সঠিক কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় না করেন, তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। হাঃ নং- ৪০২।

১৪০ সহীহুল বুখারী, অধ্যায় ঃ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী- তোমরা মাকামু ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও। হাঃ নং- ৩৯৫। সহীহ মুসলিমে অনুরূপ শব্দে বর্ণিত হয়েছে, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হাজ্জের ইহরাম বেঁধে মাক্কায় আসে, তাকে তওয়াফ ও সা'য়ী সহ যা করতে হবে। হাঃ নং- ১২৩৪।

করেন। (প্রথম তিন চক্করে) তিনি রামল (বীরত্বের সহিত দৌড়ানো) করেন। অতঃপর অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হাঁটেন। তারপর তিনি মাকামে ইব্‌রাহীম তাঁর ও বাইতুল্লাহর মাঝে রেখে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ ﴿البقرة:١٢٥﴾

"তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও।"[১৪১]

একটি বিষয় জেনে রাখা উচিত যে, ভিড়ের কারণে মাকামু ইব্‌রাহীমের পিছনে সালাত আদায় যার জন্য সহজসাধ্য, সে মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে পড়তে পারে।

শায়খ 'আবদুল আজীজ বিন বাজ বলেন : মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দু'রাকাত'আত সালাত আদায় করা তওয়াফকারীর জন্য জরুরি নয়। হ্যাঁ, কোন কষ্ট ছাড়া যদি এটা সম্ভব হয় তবে এখানে সালাত আদায় তার জন্য বৈধ। কোন ব্যক্তি যদি এ দু'রাকাত'আত সালাত মসজিদ হারাম অথবা গোটা হারামের যে কোন এক স্থানে আদায় করে তবে এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে। মাকামে ইব্‌রাহীমের আশেপাশে সালাত আদায় করার লক্ষ্যে অপরাপর তওয়াফকারীদের সাথে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। বরং তার উচিত ভিড়াভিড়ি থেকে দূরে থেকে মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে সালাত আদায় করে নেয়া। কারণ 'উমার (ﷺ) তাঁর জীবনের কোন কোন তওয়াফে দু'রাকাত'আত সালাত যু তুওয়া নামক স্থানে পড়েছিলেন। আর ঐ স্থানটি হারাম শরীফের ভিতরে ও মসজিদে হারামের বাইরে।

অনুরূপভাবে উম্মু সালামাহ (ﷺ) বিদায়ি তওয়াফের দু'রাকাত'আত সালাত মসজিদে হারামের বাইরে পড়েছেন। এর দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয়

---

১৪১ নবী ﷺ-এর হাজ্জের বর্ণনায় জাব্রি থেকে বর্ণিত নম্বর হাদীসের এটি অংশ। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ঃ হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর হাজ্জ, হাঃ নং- ১২১৮।

যে, তিনি ভিড়ের কারণে এমনটি করেছিলেন অথবা তিনি এ বিষয়ে শরিয়তের উদারতা বুঝাতে চেয়েছিলেন।[১৪২]

মাকামে ইব্‌রাহীমের কাছে এটাই হলো একমাত্র শরিয়ত সম্মত আমল যে, দূরে হলেও তার পিছনে সালাত আদায় করা। মাকামে ইব্‌রাহীমকে স্পর্শ করা, তার থেকে বরকত নেয়া এবং একে চুমু দেয়া, এর কোনটাই রাসূল (ﷺ) করেননি। এটা মুসলিম উম্মাহকে জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর বাণী :

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾البقرة:١٢٥﴾

এর ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন : মাকামে ইব্‌রাহীমের পাশে সালাত আদায়ের জন্য তারা আদিষ্ট হয়েছে, এটা স্পর্শ বা তার থেকে বরকত নেয়ার জন্য নয়।[১৪৩]

(খ) মাকামে, যেখানে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হজের ঘোষণা প্রদান করেছিলেন :

মাকামে ইবরাহীমের ফজিলত এই যে, ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বায়তুল্লাহর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পর মহান আল্লাহ তাকে মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা প্রদান করার নির্দেশ দেন, যেন তারা তালবিয়া পাঠ করতে করতে হজ পালনের জন্য উদ্দেশে তাদের প্রভুর ঘরের দিকে ছুটে আসে। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾الحج:٢٧﴾

---

১৪২ মাজমু ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়া' ঃ ২২৮/১৮।

১৪৩ ইবনে জারীর এ হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, ৪২২/১; আযরাকী, ফী আখবারে মাক্কা, ২৯/২; তারতুশী, আল-হাওয়াদেস ওয়ালবিদা'।

"(তাকে আরো আদেশ দিয়েছিলাম) তুমি মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা প্রচার করে দাও, যাতে করে তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিটে আরোহণ করে ছুটে আসে, দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে।"[১৪৪]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মাকামে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা প্রদান করলেন।

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, "ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) প্রস্ত রটির উপর দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলী তোমাদের উপর হজ ফরজ করা হয়েছে। ঘোষণাটি তিনি সে অনাগত প্রজন্মকেও শুনিয়ে দিলেন, যারা ছিল তখনও পুরুষের মেরুদণ্ডে এবং নারীদের গর্ভে। যারা ঈমান এনেছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা হজ করবেন বলে আল্লাহ জানতেন তারা এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বললেন : "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক"।[১৪৫]

সপ্তমত: সাফা ও মারওয়া

এ দু'টো পাহাড় হারাম শরীফে অবস্থিত আল্লাহ (سبحانه وتعالى)-র মহান নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ (سبحانه وتعالى) বলেন :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِّ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴿البقرة:١٥٨﴾

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড় দু'টো হচ্ছে) আল্লাহ (سبحانه وتعالى)-র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোক হাজ্জ কিংবা উমরা আদায় (করার ইচ্ছা) করে, তার জন্য এ উভয় পাহাড়ে তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই"।[১৪৬]

---

১৪৪ সূরা হাজ্জ ঃ ২৭।

১৪৫ ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৬৬৮) হাদীসের সনদ সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন।

১৪৬ সূরা আল বাক্বারাহ ঃ ১৫৮।

আল্লাহ্‌ এখানে বর্ণনা করেন যে, সাফা-মারওয়া এবং এত দু ভয়ের মধ্যে তাওয়াফ করা তার নিদর্শনা বলীর অন্তর্গত। অর্থাৎ সে সব কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ইবরাহীম (عليه السلام)-এর জন্য হজের বিধান হিসাবে প্রণয়ন করেছেন। ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর হাদিসে বলা হয়েছে যে, পানি ও পাথেয় শেষ হয়ে যাবার পর সন্তানের জন্য পানির অনুসন্ধানে বিবি হাজেরা সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে ছুটোছুটি ও প্রদক্ষিণ করার ঘটনা থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাওয়াফের বিধান চালু হয়েছে। ইবরাহীম (عليه السلام) তাদের উভয়কে জন-মানবহীন সে স্থানে রেখে চলে যান। এমতাবস্থায় বিবি হাজেরা যখন প্রাণ নাশের আশঙ্কা করলেন, তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য লাভের প্রার্থনায় রত হলেন। পানির সন্ধানে তিনি বহুবার সাফা-মারওয়া এবং এত দু ভয়ের মধ্যকার উপত্যকায় ছুটোছুটি করলেন। তিনি ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত, অভাবের কষাঘাতে ন্যুব্জ আল্লাহর করুণার মুখাপেক্ষী এক অসহায় রমণী। অবশেষে আল্লাহ তার বিপদ দূর করলেন, একাকিত্বে তার সাথি হলেন এবং কঠিন অবস্থা থেকে তাকে মুক্তি দিলেন, আর তার জন্য প্রবাহিত করলেন যমযমের বরকতময় পানি।

অতএব যিনি সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করবেন, তার উচিত হল বিনেয় ও নম্রতা সহকারে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি নিজের হাজাত, মুখাপেক্ষিতার বিষয়টি সর্বক্ষণ মনে রাখা যাতে আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন, তার অবস্থার যথাযথ সংশোধন করেন ও তার পাপ ক্ষমা করেন। আল্লাহর কাছে তার এ বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত যে, তিনি যেন তাকে তার সকল দোষ ও ক্রটি হতে উদ্ধার করেন, সরল-সঠিক পথের দিকে তাকে হেদায়াত দান করেন ও মৃত্যু পর্যন্ত তাকে হিদায়াতের উপর অবিচল রাখেন এবং ইতিপূর্বে যে পাপাচার ও নাফরমানিতে সে লিপ্ত ছিল তা হতে তাকে এক পরিপূর্ণ সার্থক জীবন, ক্ষমা, সঠিক ও সরল পথের

উপর টিকে থাকার দিকে ফিরিয়ে দেন। বিবি হাজেরা এ রকম দোয়াই আল্লাহর কাছে করেছিলেন।[১৪৭]

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا.

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা-মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফের সুন্নাত প্রচলন করেন। অতএব এ তাওয়াফ ত্যাগ করা কারো জন্য বৈধ নয়।"[১৪৮]

সে আলোকে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করা হজ ও উমরার মানাসিক তথা বিধানে পরিণত হয়, যা আদায় না করলে হজ ও উমরা পরিপূর্ণ হবে না।

আল্লাহ কুরআনে সাফার উল্লেখ দিয়ে শুরু করেছেন। তাই এ পাহাড় থেকে সা'ঈ আরম্ভ করা ওয়াজিব। সেখান থেকে মারওয়ায় গিয়ে সা'ঈ শেষ হবে এবং তা এক চক্কর বলে গণ্য হবে। সাত চক্কর পূর্ণ করা পর্যন্ত সা'ঈর কাজ করে যেতে হবে। বর্তমানে দু'টো সবুজ চিহ্নের মাঝামাঝি যে উপত্যকা রয়েছে, সেখানে যখন হাজী সাহেব নেমে আসবেন, তখন সুন্নাত হল অতি-দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া, যেভাবে জাবের (رضي الله عنه) এর হাদিসে এসেছে ...

.... حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى.

"যখন বাতনে ওয়াদীতে গিয়ে তিনি পৌঁছলেন, দৌড়ালেন। এরপর আবার হাঁটলেন।"[১৪৯]

---

[১৪৭] এ কথাগুলো ইমাম ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে (১৫/৪৩৮) উল্লেখ করেছেন।

[১৪৮] ইমাম বুখারী হাদীসটি হাজ্জ অধ্যায়ের সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ ওয়াজিব ও তা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন। হাদীস নং (১৬৪৩)

উম্মু ওয়ালীদ শাইবা (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يَقُولُ لاَ يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلاَّ شَدًّا.

অর্থাৎ- "আমি দেখলাম রাসূল (ﷺ) সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করছেন এবং বলছেন, দ্রুতবেগে দৌড়েই 'আবতাহ' স্থানটি অতিক্রম করতে হবে।"[১৫০]

মহিলারা যেন কোন প্রকার কষ্ট ও সমস্যায় না পড়ে সেজন্য সবুজ চিহ্ন দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই, ।

সাফা পাহাড়ের পুরোপুরি ঊর্ধ্বে আরোহণ করা ওয়াজিব নয়। বরং কিবলামুখী হয়ে তার এক প্রান্তে দাঁড়ানোই যথেষ্ট। এ নিয়ম একইভাবে মারওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিশেষ করে এমন একসময় যখন ভিড় বেশি হয়ে থাকে।

অষ্টমত: যমযম

যমযম হল ঐ কূপের নাম যা বর্তমানে হাজরে আসওয়াদের পূর্বে ও মাকামে ইবরাহীমের দক্ষিণে অবস্থিত। এ শব্দটি আরবি 'যামযামাহ' থেকে উদগত। সাধারণভাবে এর অর্থ আওয়াজ। ইবনে কুতাইবা বলেন, পানি উৎসারিত হলে যে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকেই আরবগণ 'যমযম' বলে অভিহিত করেন।[১৫১]

---

১৪৯ ইমাম মুসলিম হাজ্জ অধ্যায়ে 'রাসূল ﷺ এর হাজ্জ পরিচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং (১২১৮)।

১৫০ হাদীসটি বর্ণনা করেন ইবনে মাজাহ (হাদীস নং ২৯৮৭), নাসায়ী (৫/২৪২) ও আরো অনেকে। সহীহ ইবনে মাজায় (হাদীস সং ২৪১৯) শায়খ আলবানী (রহ.) হাদীসটি সহীহ বলেছেন, দেখুন আস-সিলসিলা আস-সহীহাহ ৫/৫৬৪,৫৬৫

১৫১ গরীবুল হাদীস ২/৫০২

বায়তুল্লাহর নির্মাণ কাজ সম্পর্কিত হাদিসে যমযম সৃষ্টি হওয়ার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "যখন বিবি হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে এসে উপনীত হলেন, তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। নিজেকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বললেন, থাম এবং মনোযোগ দিয়ে শোন। আবারো শব্দটি শুনতে পেয়ে বললেন, (আপনি যেই হোন না কেন) আপনি আমাকে আপনার আওয়াজ শুনিয়েছেন। আপনি কি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারেন? অকস্মাৎ তিনি দেখতে পেলেন, যমযমের স্থানে একজন ফেরেশতা গোড়ালি দিয়ে অথবা ডানা দিয়ে মাটি খনন করছে। এতে সেখানে পানি প্রবাহিত হল। আর বিবি হাজেরা হাত দিয়ে স্থানটির চারদিকে জলাধার তৈরি করে নিলেন। কোষভরে পানি নিয়ে তিনি পানপাত্র পরিপূর্ণ করতে লাগলেন। আর পানি নেয়ার পর সেখানে আরো পানি নির্গত হতে থাকল।"

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها.

"আল্লাহ উম্মে ইসমাইলকে রহম করুন, যদি তিনি (নিয়ন্ত্রণ না করে) যমযমকে ছেড়ে দিতেন অথবা বললেন, যদি তিনি কোষভরে পানি না নিতেন, তাহলে যমযম একটি প্রবাহিত স্রোতস্বিনীতে পরিণত হত। রাসূল (ﷺ) আরো বললেন, এরপর তিনি পানি পান করলেন এবং সন্তানকে দুধ পান করালেন।"[১৫২]

এ হচ্ছে আল্লাহর এক ফেরেশতার মাধ্যমে নিরাপদ হারাম এলাকায় মার্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় পানি নির্গত হওয়ার ঘটনা। হারাম শরীফের দেশে কতই না বরকতময় এ পানি!!

---

১৫২ ইতিপূর্বে হাদীসটির তাখরীজ সম্পর্কিত তথ্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ১২৫।

যমযমের পানির উপর নির্ভর করেই মক্কায় মানুষের জীবন পরিচালিত হত। এভাবেই বছরের পর বছর অতিবাহিত হল। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় যমযমের চিহ্ন মুছে গেল এবং মানুষের কাছে এর স্থান গোপন থাকল বহুদিন। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূল (ﷺ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের হাতে এ বরকতময় পানি আবারও প্রবাহিত হল। তিনিই এর চিহ্ন মুছে যাবার পর পুনরায় তা খনন করেন।

এ বরকতময় পানির ফজিলত বর্ণনায় শরিয়তের অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের দলিলগুলো উল্লেখযোগ্য :

১. যমযমের পানি দ্বারা রাসূল (ﷺ)-এর বক্ষ ধৌতকরণ :

যমযমের পানির ফজিলতের প্রমাণ বহন করছে এমন বিষয়সমূহের একটি এই যে, মিরাজের ঘটনার আগে রাসূল (ﷺ)-এর বক্ষ ধৌত করার জন্য আল্লাহ এ পানিকেই মনোনীত করেছিলেন। ইমাম বুখারি তার সহীহ গ্রন্থে আবূ যার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا...الحديث.

অর্থাৎ- "মক্কায় অবস্থানকালে একদিন আমার ঘরের ছাদ ফাঁক করা হল। এরপর জিবরীল (عليه السلام) নেমে আসলেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করলেন। এরপর তিনি হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ স্বর্ণের একটি প্লেট নিয়ে এসে আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। অতঃপর বক্ষ জোড়া লাগিয়ে আমার হাত ধরে নিকটবর্তী আসমানে আরোহণ করলেন।"[১৫৩]

২. যমযম হচ্ছে সুস্বাদু খাবার ও রোগের চিকিৎসা :

---

[১৫৩] সহীহ বুখারী- কিতাবুল হজ্জ, পরিচ্ছেদ ঃ "যমযম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে", হাদীস নং (১৬৩৬)।

যমযমের পানি হচ্ছে বরকতময় পবিত্র খাবার এবং আল্লাহর ইচ্ছায় এক উপকারী চিকিৎসা। ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে সামেত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ('আবদুল্লাহ) আবূ যার (رضي الله عنه) থেকে তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করেন এ বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) আবূ যারকে বললেন :

مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا قَالَ قُلْتُ قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ قَالَ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ.

"তুমি কতদিন ধরে এখানে অবস্থান করছ? আবূ যার বললেন, আমি এখানে ত্রিশটি দিন ও রাত ধরে অবস্থান করছি। রাসূল (ﷺ) বললেন : "কে তোমার আহার জোগাত?" আবা যার বললেন, আমি বললাম, যমযমের পানি ছাড়া আমার আর কোন খাবার ছিল না। আমি এতই মোটা হলাম যে, আমার পেটে ভাঁজ পড়ল। আমি ক্ষুধা অনুভব করতাম না। রাসূল (ﷺ) বললেন : "যমযম হল বরকতময় এবং তা সুস্বাদু খাবার।"[১৫৪]

তাবারানী আল-মু'জাম আল-কাবীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم.

"ভূ-পৃষ্ঠে যত পানি আছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম পানি হল যমযমের পানি। এতে রয়েছে খাদ্যের স্বাদ ও রোগ নিরাময়তা।"[১৫৫]

---

১৫৪ সহীহ মুসলিম- সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায় "আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফযীলত" পরিচ্ছেদ, হাদীস নং (২৪৭৩)।

১৫৫ মু'জামুত তাবারানী আল-কাবীর ১১/৯৮, হাদীস নং (১১১৬৮)। আলবানী, আস-সিলসিলা আস-সহীহায় (৩/৪৫) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুজাহিদ বলেন, “যমযমের পানি যে উদ্দেশে পান করা হয় সে উদ্দেশ্য সফল হয়। আপনি যদি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের নিয়তে তা পান করেন, তাহলে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। তৃষ্ণায় আপনি তা পান করলে তিনি আপনাকে পিপাসা নিবারণ করবেন। ক্ষুধায় আপনি তা পান করলে আল্লাহ আপনার ক্ষুধা নিবারণ করবেন। এ হল জিবরীলের পায়ের গোড়ালীর আঘাতে উৎসারিত পানি এবং ইসমাইল (عليه السلام)-এর তৃষ্ণা নিবারণকারী পানীয়।”[১৫৬]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, “আমি সহ আরো অনেকের রয়েছে যমযম পানি দ্বারা আরোগ্য লাভের বহু আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা। এ পানি দ্বারা আমি বহু রোগ থেকে আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগমুক্ত হয়েছি। অনেককে দেখেছি বহুদিন ধরে যেমন অর্ধমাস কিংবা ততোধিক সময় তারা এ পানি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং ক্ষুধা অনুভব করতেন না। আর মানুষের সাথে তাদেরই একজনের মত তারা তাওয়াফ করতেন।”[১৫৭]

৩. যমযমের পানি সর্বোত্তম পানি এবং যমযমের কূপ সর্বোত্তম কূপ :

যমযমের পানির ফজিলত আরো প্রমাণিত হয় রাসূল (ﷺ)-এর এ সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে যে, এর পানি ভূ-পৃষ্ঠের সর্বোত্তম পানি এবং অনুরূপভাবে এর কূপ সর্বোত্তম কূপ। ইতিপূর্বে ইবনে ‘আব্বাসের হাদিস বলা হয়েছে :

---

১৫৬ ইবনে ‘আব্বাস থেকে হাদীসটি মারফূ’ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যা দারাকুতনী (২/২৮৯), হাকিম (১/৬৪৬) বর্ণনা করেন। তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল। অবশ্য আবদুর রাযযাক মুসান্নিফ গ্রন্থে (৫/১১৮) ও আল-আযরুকী আখবার মক্কা গ্রন্থে (২/৫০) মুজাহিদ থেকে সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেন।

১৫৭ যাদুল মাআ‘দ (৩/৪০৬)।

خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ..... الحديث

"ভূ-পৃষ্ঠে সর্বোত্তম পানি হল যমযমের পানি ... আল হাদিস।

আমাদের এটা ও জেনে রাখা উচিত যে, এ পানি বরকতময় হওয়া সত্ত্বেও তা দিয়ে ওজু করা, গোসল করা কোন বাধা নেই এবং কাপড় ধৌত করায়ও কোন অসুবিধা নেই।[১৫৮]

৪. যমযমের পানি পানে পরিপূর্ণ তৃপ্তি অর্জন :

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّهُمْ لاَ يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ

অর্থাৎ- "আমাদের ও মুনাফেকদের মধ্যে ভেদাভেদ চিহ্ন হল তারা যমযমের পানি পানে পরিতৃপ্ত হয় না।"[১৫৯]

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে 'উসাইমীন বলেন, এটা এ কারণে যে, যমযমের পানি মিষ্টি সুস্বাদু নয়। বরং তা অনেকটা লোনা পানি। মানুষ তা এজন্যই পান করে যে, এ পানির মধ্যে যে বরকত রয়েছে তার প্রতি তার ঈমান রয়েছে। সুতরাং এ পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া তার ঈমানেরই পরিচায়ক।"[১৬০]

মক্কার বাইরে যমযম নিয়ে যেতে কোন বাধা নেই। কেননা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি মক্কার বাইরে যমযম

---

[১৫৮] দেখুন, মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায (১৭/২৩০)

[১৫৯] হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ (৩০৬১) হাকীম মুস্তাদরাক গ্রন্থে (১/৪৭৩), বায়হাকী সুনান কুবরা গ্রন্থে (৫/১৪৭), তয়ালিসি ও আরো অনেকে। বুসিরি 'মিসবাহুয যুজাজা' গ্রন্থে (৩/৩৪) বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

[১৬০] আশ-শারহুল মুমতি' (৭/৩৭৯)।

নিয়ে যেতেন এবং এটাও বলেছেন যে, রাসূল (ﷺ)-ও এমনটি করতেন।[১৬১]

নবমত : আরাফাত, মিনা, মুযদালিফা :

হারাম শরীফ ও এর আশে-পাশের যে সকল সম্মানিত স্থানে গিয়ে হজের ফরজ আদায়ের জন্য শরিয়ত প্রণেতা নির্দেশ দিয়েছেন, সে সম্মানিত স্থানসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে আরাফাত, মিনা, ও মুযদালিফা। অবশ্য আরাফাত হারামের সীমানার অন্তর্ভুক্ত নয়। শরিয়তের এমন বহু দলিল রয়েছে যা এ সকল স্থানের কথা উল্লেখ করেছে কিংবা এগুলোর ফজিলত ও এসব স্থানে যে সকল আমল, এবাদত ও হজের কাজ করতে হয় তা বর্ণনা করেছে। এসব দলিলের মধ্যে রয়েছে :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿البقرة:١٩٨-١٩٩﴾

“হজের এ সময়গুলোতে যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করতে গিয়ে কোনো অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চাও, তাতে কোনোই দোষ নেই, অতঃপর তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসবে তখন (মুযদালিফায়) ‘মাশআরে হারাম’ এর কাছে এসে আল্লাহকে স্মরণ করবে। ঠিক যেমনি করে আল্লাহ তাআলা তোমাদের (ডাকার) পথ বাতলে দিয়েছেন, তেমনি করে তাকে স্মরণ করবে। যদিও

---

১৬১ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, হাদীস নং (৯৬৩) এবং বলেন যে, “হাসান-গরীব” ইমাম বুখারী আত-তারীখ আল-কাবীর গ্রন্থে (৩/১৮৯),বায়হাকী আস-সুনান আল-কুবরা গ্রন্থে (৫/২০২) এ হাদীস বর্ণনা করেন। আলবানী আস-সিলসিলা আস-সহীহায় (২/৫৭২) একে সহীহ বলেছেন।

ইতিপূর্বে তোমরা ভ্রষ্টদের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলে। তারপর তোমরা সে স্থান থেকে ফিরে এসো যেখান থেকে অন্যান্য (হজ পালনকারী) ব্যক্তিরা ফিরে আসে, আর (নিজেদের ভুল ভ্রান্তির জন্য) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।"[১৬২]

এ আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবে আরাফাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং "যেখান থেকে অন্যান্য হজ পালনকারী ব্যক্তিরা ফিরে আসে" একথা দ্বারা আরাফাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'মাশআরুল হারাম' আরাফাতের দুই সরু পথ ধরে 'মুহাসসার'এর দিকে যাওয়ার পথে মুযদালিফার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।[১৬৩]

ইবনে কাসীর (রহ:) বলেন, "আল্লাহ তাআ'লা এখানে আরাফাতে অবস্থানরত ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করছেন যেন সে মাশআরুল হারামের কাছে গিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য মুযদালিফা পানে অগ্রসর হয়। তিনি তাকে এ নির্দেশও প্রদান করছেন যে, আরাফাতের সর্বসাধারণের সাথে তার 'অকুফ' (অবস্থান) যেন তেমনি হয় যেমনি সর্বসাধারণ সেখানে ওকুফ করে থাকে।

আর মুশরিক কুরাইশদের মত অকুফ যেন না করা হয়। কেননা তারা হারাম থেকে বের না হয়ে হারামের এক প্রান্তে 'হিল' এর নিকটবর্তী স্থানে ওকুফ করত এবং বলত, আমরা আল্লাহর শহরে তারই ঘরে তারই পরিবার ভুক্ত।

ইমাম বুখারি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন :

كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا.

---

১৬২ সূরা আল-বাক্বারাহ ঃ ১৯৮-১৯৯।

১৬৩ দেখুন, তাফসীরে তাবারী (১/১৬৭)।

"কুরাইশগণ ও তাদের ধর্মের অনুসারীবৃন্দ মুযদালিফায় অকুফ করত এবং একে তারা নাম দিয়েছিল 'হুম্‌স' বলে। আর আরবের অন্য সকলেই আরাফাতে অকুফ করত। ইসলামের আগমনের পর আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে আরাফাতে এসে ওকুফ করার ও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। তাঁর এ নির্দেশ হল :

ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ.

"তারপর তোমরা সে স্থান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে অন্যান্য (হজ পালনকারী) ব্যক্তিরা ফিরে আসে।"[১৬৪]

অনুরূপ বলেছেন ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, কাতাদাহ, সুদ্দী ও আরো অনেকে এবং ইবনে জারির এমত এখতিয়ার করেছেন এবং এর উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে তিনি বর্ণনা করেছেন।"[১৬৫]

সম্মানিত স্থানের বর্ণনায় আরো রয়েছে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴿البقرة:٢٠٣﴾

"নির্দিষ্ট (এ কয়টি) নির্দিষ্ট দিনসমূহ আল্লাহকে স্মরণ কর। (হজের পর) যদি কেউ তাড়াহুড়া করে দু'দিনের মধ্যেই (মক্কায় ফিরে আসে) তাতে কোন দোষ নেই। আর যদি কোন ব্যক্তি আরো বিলম্ব করতে চায়, তবে তাতেও কোন দোষ নেই। এ বিধান তার জন্য যে আল্লাহকে ভয় করে।"[১৬৬]

---

১৬৪ সহীহ বুখারী- কিতাবুত তাফসীর পরিচ্ছেদ।
১৬৫ তাফসীরে ইবনে কাসীর (১/২৪২)।
১৬৬ সূরা আল-বাক্বারাহ ঃ ২০৩।

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٧-٢٨﴾

"(তাকে আরো আদেশ দিয়েছিলাম) তুমি মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা প্রচার করে দাও, যাতে তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে আরোহণ করে ছুটে আসে, দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। যাতে করে তারা তাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য এখানে এসে হাজির হয় এবং (কুরবানির) নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম নেয়, সে সকল পশু কুরবানি করার সময়, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন।"[১৬৭]

এ দু'টো আয়াতে মিনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কেননা فِي أَيَّام مَّعْدُودَاتٍ বা নির্দিষ্ট দিনসমূহ বলতে এখানে মিনার 'আইয়ামে তাশরীক' কে বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন, "এ ব্যাপারে 'আলেমগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই যে, এ আয়াতে বর্ণিত أَيَّام مَّعْدُودَاتٍ বা নির্দিষ্ট দিনসমূহ হল মিনার দিনগুলো। আর তা হচ্ছে আইয়ামে তাশরীক।"[১৬৮]

আর সুরা হজে বর্ণিত أَيَّام مَّعْدُودَاتٍ বা নির্দিষ্ট দিনসমূহ বলতে কিছুটা মতভেদের পরিপ্রেক্ষিতে মিনার সবগুলো কিংবা কিছু দিন বুঝানো হয়েছে। ইমাম তবারী أَيَّام مَّعْدُودَاتٍ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, "ব্যাখ্যা কারদের কারো কারো মতানুযায়ী এ দিনগুলো হচ্ছে আইয়ামু তাশরীক, আবার কারো মতে এগুলো যিলহজের প্রথম দশদিন। কেউ বলেন, এগুলো হল কুরবানির দিন ও তাশরীকের দিনসমূহ।"[১৬৯]

---

১৬৭ সূরা আল-হাজ্জ ঃ ২৭-২৮।

১৬৮ আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন (৩/১)

১৬৯ তাফসীর তবারী (১৭/১০৮)।

ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে মারফু' পন্থায় মসজিদে খাইফ সম্পর্কে যে হাদিস এসেছে তা মিনার সাথেই সংশ্লিষ্ট। হাদিসটি হলঃ

صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا.

"মসজিদুল খাইফে সত্তর জন নবী সালাত আদায় করেছিলেন।"[১৭০]

আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'মুর আদ-দাইলি (ﷺ) এ সকল স্থানের প্রত্যেকটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন :

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ

"রাসূল (ﷺ) আরাফাতে অবস্থানকালে নজদবাসী কিছু লোক তার কাছে এসে হজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি এক ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলে সে ঘোষণা করল : "আরাফাতে অবস্থানই হজ। যে ব্যক্তি রাতে এসে পরদিন ফজর উদয় হওয়ার আগেই আরাফায় অবস্থান করে, সে হজ করতে পারল। মিনার দিন হচ্ছে তিনটি। যদি কেউ তাড়াহুড়ো করে দু'দিনের মধ্যেই মক্কায় ফিরে আসে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। আর যদি কোন ব্যক্তি আরো বিলম্ব করে, তবে তাতেও কোন দোষ নেই।"[১৭১]

রাসূল (ﷺ) বলেন :

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ.

---

১৭০ হাদীসটি তবারানী আল-কাবীর গন্থে (৩/১৫৫) ও আল আওসাত গ্রন্থে (১/১১৯) এবং আল আযরুকী আখবারে মাক্কায় (৩৫,৩৮) বর্ণনা করেছেন। মুনযেরী বলেন, এর সনদ হাসান (২/১১৬)। আলবানী তাহযীরুস মাজেদ (পৃঃ ১০৬) গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন।

১৭১ হাদীসটির শব্দ তিরমিযী থেকে নেয়া হয়েছে। হাদীস নং (৮৮৯)। এটি আরো বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ হাদীস নং (১৯৪৯), নাসায়ী (৫/২৬৪-২৪৫) ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং (৩০১৫)। এ হাদীসের সনদ শুদ্ধ।

"আরাফাতের পুরোটাই অকুফের স্থান, মিনার পুরোটাই কুরবানির স্থান এবং মুযদালিফার পুরোটাই অকুফের স্থান। আর মক্কার সকল প্রান্ত রই হল চলাচলের রাস্তা ও কুরবানির স্থান।"[১৭২]

শরিয়তের এ সকল কাওলি (বক্তব্যমূলক) দলিলসমূহ হজের স্থান নির্ধারণ ও হজের শরয়ী কাজ-কর্ম সম্পাদনের জন্য এ সকল স্থানে অবস্থানের ব্যাপারে পেশ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি হজ পালনের জন্য নবী (ﷺ)-এর ফে'ল তথা কর্ম বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। কেননা তিনি কার্যত এ সকল স্থানে অবস্থান করেছেন, আল্লাহকে স্মরণ করেছেন এবং হজের যাবতীয় আমল সম্পাদন করেছেন এবং সাহাবিদের মধ্যে এ ঘোষণা দিয়েছেন যে,

لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ

"তোমরা (আমার কাছ থেকে) হজের হুকুম গ্রহণ কর।"[১৭৩]

এ সকল স্থানের ফজিলত ও শরিয়ত কর্তৃক এগুলোকে সম্মান প্রদানের বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত প্রদানকারী এই হচ্ছে আমলী দলিল।

---

১৭২ আবু দাউদ সহীহ সনদে এ শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং (১৯৩৬) ও ইবনে মাজায়ও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে (৩০৪৮ নং)

১৭৩ ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাজ্জ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ মুস্তাহাব, হাদীস নং (১২৯৭) আর নাসায়ী বর্ণনা করেছেন (৫/২৭০) নিম্নোক্ত শব্দে ঃ خُذُوْا مَنَا سِكَكُمْ

তৃতীয় অধ্যায়

হারাম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে করণীয় ও বর্জনীয়

হারাম শরীফ থেকে দূরবর্তী যে সকল দেশের মুসলিমদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে থাকে, তারা কা'বা শরীফ দেখার জন্য উদগ্রীব থাকে এবং এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, সুযোগ হলে তারা মক্কা এসে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে ও এখানে কিছুদিন অবস্থান করবে। তাদের কেউ যখন কা'বার ছবি দেখে, এর প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ও ভালোবাসায় তখন কেঁদে ফেলে। সরাসরি দেখতে না পারার বেদনায় তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। সরাসরি কা'বা দেখেছে এমন কোন মুসলিম ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হলে সে তার চক্ষু দ্বয়ে চুমু খায় ও ভীষণ খুশি হয়।

এসব বিষয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হারাম শরীফে আগত ও অবস্থানকারী ব্যক্তির উচিত হল সে যেন ঐ অনুগ্রহের কথা উপলব্ধি করে, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন এবং সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করে, যা লাভের আকাঙ্ক্ষা করেও বহু লোক তা লাভ করতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন নবী (ﷺ)-কে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয়, তখন তিনি বলেছিলেন :

والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت.

“আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে প্রিয় জমিন। যদি তোমার থেকে আমাকে বহিষ্কার করা না হত, তাহলে স্বেচ্ছায় আমি বের হতাম না।”[১৭৪]

সুতরাং ঐ ব্যক্তির কীরূপ উপলব্ধি করা উচিত, যে ব্যক্তি মক্কার জমিনে জন্মগ্রহণ করেছে, তথায় অবস্থিত যমযমের পানি পান করেছে, সেখানে বেড়ে উঠেছে ও জীবন যাপন করেছে, কেউই তাকে সেখান থেকে বের করে দিচ্ছে না এবং কোন জালিম সেখানে বসবাস করা থেকে তাকে বাধাও দিচ্ছে না।

সালাফে সালেহীন বায়তুল্লাহর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং অন্তরে এর প্রতি এক বিশাল শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এমনকি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় মক্কায় অবস্থানের ব্যাপারেও তারা বিচলিত থাকতেন।

ইবনে রজব বলেন, একদল সাহাবি মক্কায় অবস্থান করা থেকে বিরত থাকতেন- এ ভয়ে যে, না জানি সেখানে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়েন ......। উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কায় একটি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অন্যত্র সত্তরটি গুনাহে লিপ্ত হওয়াও আমার কাছে অধিকতর সহজ।[১৭৫]

হারাম শরীফে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়াকে কীভাবে বান্দা ভয় না পেয়ে থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ্ বলেছেন :

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج:٢٥]

“আর যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘনের মাধ্যমে মসজিদুল হারামে অন্যায় ও বাতিল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তাকে আমি পীড়াদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।”[১৭৬]

---

১৭৪ ইতোপূর্বে হাদীসটির রিওয়ায়াত সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হয়েছে। দেখুন পৃঃ

১৭৫ জামি‘ আল ‘উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ৩৩২।

১৭৬ সূরা আল-হাজ্জ ঃ ২৫।

হারাম শরীফে বাতিল কাজে লিপ্ত ব্যক্তির অপরাধ ভয়াবহ এবং এর পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য মানুষ তিনজন: হারাম শরীফের সীমানায় অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তি, ইসলামের মধ্যে জাহেলী যুগের প্রথা প্রচলনে আগ্রহী ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি যে অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত ঘটাতে (প্রাণ সংহার করতে) চায়।[১৭৭]

ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর পূর্বোক্ত বাণী-

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿الحج:٢٥﴾

এ ব্যাপারে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এডেন শহর থেকেও হারামে অন্যায় ও পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তাকেও আল্লাহ অবশ্যই মর্মান্তিক শাস্তি প্রদান করবেন।[১৭৮]

আয়াতটির অর্থের ব্যাপারে সালাফে সালেহীন থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত সমূহ উল্লেখ করে ইবনে কাসীর বলেন : এ বর্ণনাসমূহ দ্বারা যদিও বুঝা যায় যে, এগুলোতে বর্ণিত কাজসমূহ 'ইলহাদ', তবু সঠিক বক্তব্য হচ্ছে 'ইলহাদ' আরো ব্যাপকার্থক। এ দ্বারা আরো ভয়াবহ কাজে এ স্থানে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে। এ জন্যই হস্তীবাহিনী যখন বায়তুল্লাহ ধ্বংসের ইচ্ছা করেছিল, আল্লাহর তাদের উপর আবাবীল পাখি পাঠালেন, যারা তাদের উপর সিজ্জীল পাথর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন। অর্থাৎ

---

[১৭৭] সহীহুল বুখারী- কিতাবুদ দিয়াত, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত ঘটাতে চায়, হাদীস নং ৬৮৮২।

[১৭৮] আল-মুসতাদরাক ২/৩৮৮। হাকিম বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবীও একে সহীহ বলেছেন। তবে বুখারী ও মুসলিমে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।

তাদেরকে ধ্বংস করে বায়তুল্লায় খারাপ কাজের ইচ্ছা পোষণকারীদের জন্য শিক্ষা লাভের উপকরণ করে দিয়েছেন।[১৭৯]

আশ্চর্যের বিষয় হল জাহেলী যুগের লোকেরাও হারাম শরীফের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত এবং এর মর্যাদার কথা মনে রেখে বায়তুল্লাহর যাবতীয় অধিকার রক্ষা করত। এ সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি নীচে পেশ করা হল:

হামাবী বলেন, হারব ইবনে উমাইয়া বলেছেন : হাদরামী নামক এক ব্যক্তি মক্কায় অবতরণের দিকে আহ্বান জানালেন। তিনি হারব ইবনে উমাইয়ার মিত্র বনী নাফাসা গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তার উপনাম ছিল আবূ মাতার। হারাম সীমানার বাইরে তিনি অবতরণ করতে চাইলে হারব নিম্নের চরণগুলো আবৃত্তি করলেন :

أبا مطر هلم إلى الصلاح – فيكفيك الندامى من قريش
وتنزل بلدة عزت قديما – وتأمن أن يزورك رب جيش
فتأمن وسطهم وتعيش فيهم – أبا مطر هديت بخير عيش

অর্থাৎ- "হে আবূ মাতার! আপনি কল্যাণের দিকে আসুন। কুরাইশদের অনুতপ্ত লোকেরাই আপনার জন্য যথেষ্ট। আপনি এমন শহরে অবতরণ করছেন, যা আদিকাল থেকে মর্যাদাপূর্ণ। কোন সেনাদলের অধিপতির সাথে সাক্ষাৎ থেকে আপনি নিরাপদ থাকবেন। আপনি তাদের মধ্যে নিরাপদে থেকে তাদের সাথে বসবাস করবেন। হে আবূ মাতার! আপনি উৎকৃষ্ট জীবন প্রাপ্ত হোন- এটাই কামনা।"

দেখাই যাচ্ছে, কীভাবে হারব তাকে তার মক্কায় অবস্থানকালে নিরাপত্তা প্রদান করছিলেন।[১৮০]

বায়তুল্লাহর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা পোষণের আরেকটি বহিঃপ্রকাশ ছিল এই যে, যখন তারা বায়তুল্লাহকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে চেয়েছিল, তখন এর খরচের পুরোটাই যেন উত্তম ও হালাল রোজগারের মধ্য হতে হয় সে ব্যাপারে তারা ছিল খুবই উৎসুক। ইবনে ইসহাক তার সিরাত

---

১৭৯ তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/২১৫।

১৮০ মু'জামুল বুলদান ৫/২১৩

গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওহাব ইবনে ‘আমর কুরাইশদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের উপার্জন হতে এ কাজে উত্তম রোজগার ছাড়া আর কিছু খরচ করো না। তোমরা এতে বেশ্যার উপার্জন, সুদি বেচা কেনার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ এবং কোন মানুষের প্রতি জুলুম করে উপার্জিত সম্পদের কোন কিছু মিশ্রিত করো না।[১৮১]

এজন্যই বায়তুল্লাহ নির্মাণের প্রয়োজনীয় খরচের অর্থ তাদের কাছে সংগৃহীত হয়নি। যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেছিলেন :

إن قومك قصرت بهم النفقة.......

“তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ব্যয়ের অর্থ কম ছিল....।[১৮২]

অর্থাৎ বায়তুল্লাহর নির্মাণকালে। ফলে তারা ‘আল-হিজর’এর দিক থেকে ইবরাহীম (عليه السلام)-এর ভিত্তি নির্মাণ কাজে অপারগ হলেন, যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

জাহেলী যুগে কুরাইশদের কাছে বায়তুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার আরো প্রমাণ হল এই যে, তারা সকল আরবের উপর এটা শিরোধার্য করে দিয়েছিল যে, হারামে প্রবেশ করলেই তারা ‘হিল’ তথা হারাম সীমানার বাইরের পাথেয় রেখে আসবে এবং ‘হিল’ এর পোশাক ছেড়ে হারামের পোশাক পরবে। ক্রয় করার মাধ্যমে কিংবা ধার করে হোক অথবা দানের মাধ্যমে লাভ করে হোক। যদি তারা পোশাক না পেত, তাহলে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত।[১৮৩]

জাহেলী যুগের এক মহিলা তার কোন এক ছেলেকে হারাম শরীফের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের অসিয়ত করে বলছেন :

---

[১৮১] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২২০, আল-খাবার ফিস সিয়ার ওয়াল-মাগাযী পৃঃ ১০৪, তারীখুত তাবারী ২/২৮৭, ইবনে হিশাম এ উদ্ধৃতিটি আয়েয ইবনে ইমরান ইবনে মাখযুম থেকে বর্ণনা করেন।

[১৮২] সহীহুল বুখারী- কিতাবুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ মাক্কার ফযীলত ও এর নির্মাণ কাজ- হাদীস নং ১৫৮৪।

[১৮৩] ফতহুল বারী ৫/২১৪, উরওয়া ইবনেয যুবাইয়ের বক্তব্য এ ব্যাপারে মূল দলীল। দেখুন- সহীহুল বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ-অনুচ্ছেদ ঃ অকুফে আ’রাফা-হাদীস নং ১৬৬৫।

أبني لا تظلم بـمكة – لا الصغير ولا الكبير

أبني من يظلم بـمكة – يلق آفات الشرور

أبني قد جـربـتهـا – فوجدت ظالـمها يـبور.

অর্থাৎ- “হে প্রিয় বৎস! মক্কায় ছোট হোক ও বড় হোক, কোন ধরনের জুলুম করো না। ছেলে আমার! জেনে রাখ, যে মক্কায় জুলুম করে, সে একরাশ মন্দের মুখোমুখী হবে। প্রিয় বৎস আমার! এখানে জুলুম ও অন্যায় করেছে এমন লোকদের ধ্বংস হয়ে যেতে আমি দেখেছি।”[১৮৪]

জাহেলী যুগের লোকেরা বায়তুল্লাহকে এভাবেও সম্মান প্রদর্শন করত যে, কোন ব্যক্তি তার বাবার হত্যাকারীকে এখানে দেখতে পেলে প্রতিশোধ স্পৃহায় উত্তেজিত ও বিচলিত হত না এবং প্রতিশোধ নিয়ো না। ইমাম কুরতুবী বলেন, জাহেলী যুগে যারা হারামে প্রবেশ করে আশ্রয় নিত, তারা আক্রমণ ও হত্যার হাত থেকে নিরাপদ থাকত।[১৮৫]

এটাই ছিল যখন জাহেলী যুগের লোকদের অবস্থা, তখন এ পার্থক্যের কথা ভেবে অবাক হতে হয় যে, বর্তমানে বহু সংখ্যক মুসলিম হারাম শরীফের হক ও অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত। এর প্রতি তাদের অন্তরে সম্মানবোধের মাত্রা খুবই কম। তারা সেখানে এমন সব কাজ করে থাকে, যা ভূ-পৃষ্ঠের সবচেয়ে সম্মানিত স্থানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণকারীদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

অথচ আমরা দেখি রাসূল (ﷺ) শিরক ও পাপ এবং নাজাসাত ও অপবিত্র বস্তু হতে মক্কাকে পবিত্র করতে খুবই উৎসুক ছিলেন। আজকের যুগে কিছু লোক শরিয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ে জাহেলী যুগের লোকদের অনুকরণে লিপ্ত হয়েছে এবং যে সম্মান প্রদর্শন তাদের উপর ওয়াজিব ছিল, তার বিপরীত অনেক কাজ তারা করছে। গায়রুল্লাহর উদ্দেশে কোন এবাদত আদায়ের মত ভয়াবহ ও মারাত্মক অন্যায় কাজ তারা সেখানে

---

[১৮৪] এ চরণগুলোর রচয়িতা হলেন সুবাই'য়াহ বিনতে আহব্ব। তিনি তার ছেলে খালিদ ইবনে আবদে মুন্নাফকে মাক্কার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অসিয়ত করেছিলেন এবং এখানে অন্যায় ও গর্হিত কাজ করা থেকে নিষেধ করেছিলেন। এটি একটি বড় কাসীদা। দেখুন- সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২৫, আল-বিদয়া ওয়ান নিহায়া ৩/১২৬।

[১৮৫] আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন ৪/৯১।

করছে। যেমন- ঘরবাড়ি নির্মাণের সময় এখানে তারা পশু জবেহ করছে, তাদের ধারণা অনুযায়ী জিনের ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য জাদুকর ও মন্ত্র-তন্ত্রের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁককারীদের কাছে তারা এসে থাকে, সালাত আদায়ে অলসতা প্রদর্শন করে থাকে, বরং অনেকে সালাতেও ত্যাগ করে থাকে, জন সাধারণ্যে প্রচলিত বিদ'আতী দু'আ ও যিকির তারা এখানে পাঠ করে থাকে, আল্লাহর কাছে ছাওয়াব লাভের উদ্দেশে তারা বিভিন্ন বিদ'আতী উৎসব পালন ও মৌসুমি রাত্রি জাগরণ করে থাকে, এখানে তারা বেশ কিছু স্থান, গিরিপথ ও কূপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান শরিয়ত প্রণয়ন করেনি। অনেকে আবার এখানে অশ্লীল কাজ করে থাকে, নেশাকর বস্তু পান করে, মাদকদ্রব্যের আদান-প্রদান করে, ভিডিও ক্যাসেট, হারাম গান কিংবা ডিশ এন্টিনার মত হারামের দিকে উদ্বুদ্ধকারী মাধ্যমসমূহ বেচা-কেনা করে, কেউ আবার অসৎলোকদের সাথে আড্ডা দেয়, রাত জেগে এমন সব হারাম কাজে লিপ্ত থেকে সময় কাটায়, একজন মুসলিমের জন্য যেসব কাজ করা শুধু হারাম শরীফেই নয়, বরং যে কোন স্থানেই পুরোপুরি অসংগত।

এ পবিত্র স্থানের মর্যাদাকে যারা খুবই খাটো করে দেখে, তাদের ব্যাপারটি কতই না আশ্চর্যজনক! কীভাবে তারা এমনটি করে? অথচ "আল্লাহর হারামে, তাঁর পবিত্র শহরে ও এর ভূমিতে কোন পাপ কাজ করা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে করার চেয়েও ভয়াবহ..."।[১৮৬]

অতএব পবিত্র হারামের দেশে বসবাসকারীদের উপর আরোপিত দায়িত্ব অন্য যে কারো চেয়ে অনেক বেশি। তাই অন্যদের চেয়েও উত্তম আদর্শের গুণে গুণান্বিত হওয়া তাদের জন্যই বেশি বাঞ্ছনীয় ও সমুচিত। এ কাজটি করার জন্য সালাফে সালেহীনের জীবনী অধ্যয়ন করা তাদের প্রয়োজন, কীভাবে সালাফগণ পরিপূর্ণ হক আদায় করে বায়তুল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন, এ অনুভূতি সহকারে যে, তা অন্তরের তাকওয়ারই অংশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]

---

১৮৬ যাদুল মাআ'দ ১/৫১।

"এটাই আল্লাহর বিধান। অন্যদিকে কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনা বলীকে সম্মান করলে তা হবে হৃদয়ের তাকওয়া সঞ্জাত।"[১৮৭]

শাইখ আবদুর রহমান সা'দী (রহ.) বলেন, "আল্লাহর নিদর্শনা বলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হৃদয়ের তাকওয়া থেকেই সৃষ্ট। কেননা এটা সম্মান প্রদর্শনকারীর তাকওয়া ও বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ। কারণ নিদর্শনা বলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন মূলত: আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই নামান্ত র"।[১৮৮]

এভাবে সালাফে সালেহীনের অবস্থা জানা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা সহজ হবে, তাদের নীতির আলোকে জীবন পরিচালনা করা যাবে এবং আল্লাহ যেগুলোকে সম্মান দিয়েছেন, সেগুলোর প্রতি সঠিক পদ্ধতিতে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে তারা যে পথ ধরে চলেছেন, সে পথের অনুগামী হওয়া যাবে।

সম্মান প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা এমন কিছু প্রতীকী ও বাহ্যিক কাজ-কর্ম করবে, যে কাজগুলো অনুমোদনের ব্যাপারে শরিয়তে কিছুই আসেনি এবং সালাফে সালেহীন (رضي الله عنه)-ও এগুলো করেননি।

আজ জনসাধারণের কাছে এমন কিছু বাতিল আক্বীদা ও প্রথা পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ শরিয়ত বিরোধী। এগুলো তাদেরকে এমন সব ইবাদত পালনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা নতুন উদ্ভাবিত। তাদের ধারণার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য ও ছাওয়াব অর্জন করছে। এসব কাজের কোন শরয়ি দলিল ছাড়াই তারা এগুলো দ্বারা সম্মান ও তাযীম প্রদর্শনের নিয়ত করছে। কিছু সংখ্যক মুসলিম কর্তৃক পালিত সম্মান প্রদর্শনের কিছু চিত্র আমরা এখানে তুলে ধরছি, যা শরিয়তে অনুমোদিত নয়।

---

[১৮৭] সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৩২।

[১৮৮] তাইসিরুল কারিম আর-রহমান ৩/৩২০।

১- সালাত আদায় করা, দু'আ করা ও বরকত লাভের উদ্দেশে কতিপয় স্থান যিয়ারত করা, যেমন- গারে হেরা, গারে সাওর, জাবালে আরাফাত এবং রাসূল (ﷺ)-এর জন্মস্থান বলে কথিত স্থান।[১৮৯]

---

[১৮৯] যে স্থানে রাসূল ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে স্থান নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোন সঠিক নির্ভরযোগ্য পাওয়া যায় না। ইবনে ইসহাক সর্বপ্রথম তা নির্ধারণ করেছিলেন এবং তারপর সীরাহ গ্রন্থের রচয়িতাগণ এ বিষয়ে তাকে অনুসরণ করেছিলেন। তবারী তার 'তারীখ' গ্রন্থে (১/৪৫৩) বলেন, ইবনে হুমাইদ সালামাহ থেকে এবং তিনি ইবনে ইসহাক থেকে আমার কাছে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমুল ফীল বা হস্তি-বর্ষে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি 'দার ইবনে ইউসুফ' নামক ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক থেকে এ বর্ণনার সনদটি খুবই দুর্বল। এ সনদে রয়েছে ঃ মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ ইবনে হিব্বান আর-রাযী। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার দুর্বলতার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তিনি মাকলূব ও মুনকার হাদীসসমূহ বর্ণনা করতেন। ইমাম নাসায়ী, আবূ যুরআ' ও ইবনে দারাহ বলেন, তাকে লোকেরা মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। আর 'আলেমদের কেউ কেউ তার যে প্রশংসা করেছেন তা এজন্য যে, তিনি সুন্নাহর ব্যাপারে কঠিন ছিলেন। দেখুন- তাহযীবুল কামাল (২৫/১০৭-১০৮), আল-কামিল, ইবনে আ'দী (৩/৯৯)। আর সালামাহ হচ্ছেন ইবনুল ফাদল আল-আবরাশ। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল রাবী এবং মাগাযী তথা যুদ্ধের বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। দেখুন- তাহরীর আত-তাকরীব (২/৫৯)। আর ইবনে ইসহাক হচ্ছেন রাবী হিসাবে 'সদূক' (সত্যবাদী)। তিনি কর্মবাচ্যের শব্দে জন্মস্থান নির্ধারণের সংবাদটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কথিত আছে যে, তিনি 'দার ইবনে ইউসুফ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, তার থেকে বর্ণিত নির্ধারণের খবরটি দুর্বল। কেননা তিনি এ খবরের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না।

এ খবরটি দুর্বল হওয়ার আরো প্রমাণের মধ্যে রয়েছে, ইবনে ইসহাক থেকে ইউনুস ইবনে বুকাইর এর বর্ণনায় নবী ﷺ-এর জন্মের ঘটনা ইবনে ইসহাকের গ্রন্থের যে অংশে বর্ণিত হয়েছে, সেটি ইতোমধ্যেই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে জন্মস্থান সম্পর্কিত খবরটি নেই।

ইবনে ইসহাক থেকে যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বুকালির বর্ণনায় সীরাতে ইবনে হিশামেও এ খবরটি নেই। ইবনে আ'সাকির 'তারীখে দিমাশক' গ্রন্থের শুরুতে নবীজীর সিরাত সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের খবরসমূহ বর্ণনা করেছেন, সেখানেও এটি নেই।

তদুপরি ইবনে ইসহাক যদি নবী ﷺ থেকে কোন খবর নিশ্চিত হয়েও বর্ণনা করেন, তবু তা হচ্ছে 'মু'দাল'। কেননা তিনি শুধু দু'টো মাধ্যমেই নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে মাধ্যম দু'টোর স্থান সনদের প্রথম দিকে। অতএব কোন অবস্থাতেই জন্মস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ খবরটির উপর নির্ভর করা শুদ্ধ নয়। এ জন্যই সালেহী সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ' গ্রন্থে

(১/৩৭) রাসূল ﷺ-এর জন্মের আরো কয়েকটি স্থান উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সীরাত লেখকগণও এসব স্থান উল্লেখ করেছেন। যদিও সীরাত গ্রন্থের অধিকাংশ রচয়িতাগণ মনে করেন যে, রাসূল ﷺ-এর জন্ম মাক্কাতেই হয়েছিল, কিন্তু স্থানটি সুনির্দিষ্টভাবে তারা নির্ধারণ করেননি।

নবী ﷺ-এর জন্মস্থান নির্ধারণের বিষয়টি যে কারণে আরো অধিক দুর্বল বলে মনে হয় তা হল, যে বৃক্ষটির কাছে বাইয়া'তুর রিদওয়ান সম্পন্ন হয়েছিল, সেটি সাহাবাগণ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের অধিকাংশই নিশ্চিতভাবে বৃক্ষটির স্থান নির্ধারণে সক্ষম ছিলেন না। অথচ তারা ছিলেন বাইয়াতের ঘটনার খুবই কাছাকাছি সময়ের এবং তারা প্রায় সকলেই তাতে উপস্থিত ছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলাও সূরা আল-ফাতহে বাইয়াতের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা পরবর্তী বৎসর ফিরে আসলাম। আমাদের মধ্য থেকে কোন দু'জন ব্যক্তিও সে গাছটির ব্যাপারে একমত হতে পারলো না যে গাছটির নিচে আমরা বাইয়াত করেছিলাম। বুখারী ২৯৫৮ নং হাদীসে এটি বর্ণনা করেন।

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, আমার বাবা বলেছেন, তিনি সে সকল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমরা পরবর্তী বছর আসলে গাছটিকে ভুলে গেলাম। গাছটি আর চিনতে পারলাম না।

সাঈদ বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণ গাছটি চিনত না। আর তোমরা তা জান! তাহলে তো তোমরা বেশি জান!! বুখারী ৪১৬৩ নং হাদীসে এটি বর্ণনা করেন।

অতএব সাহাবাদের দু'জন ব্যক্তিও যখন গাছটির স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে একমত হতে পারলেন না, অথচ ঘটনাটি ছিল খুবই নিকটবর্তীকালের, তাহলে রাসূল ﷺ-এর জন্মস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে একমত না হওয়ার ব্যাপারটি আরো উত্তমভাবে প্রযোজ্য; কেননা ঘটনাটি ছিল অনেক আগের। আর এসব কিছু জানার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ না থাকার কারণ ছিল যাতে সে সকল মাধ্যম প্রতিহত হয় যা শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের দিকে পরিচালিত করে। উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ রকমই করেছিলেন যখন তাকে বলা হলো- একটি গাছ সেখানে আছে, মানুষের ধারণা এর নিচে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়েছিল। এর কাছে এসে তারা সালাত আদায় করে। তিনি গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিলে গাছটি কেটে ফেলা হল, যাতে মানুষ একে উৎসবের উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ না করে। ইবনে সা'দ 'তাবাকাত' গ্রন্থে সহীহ সনদে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর জন্মস্থান নির্ধারণের বিষয়টিকে যারা অস্বীকার করেছেন তাদের একজন হলেন আল-ইয়াশী আল-মাগরিবি (মৃত্যু ১০৯১ হিঃ)। তিনি তার বিখ্যাত মাক্কা ভ্রমণ (১/২২৫) গ্রন্থে রাসূল ﷺ-এর জন্মস্থান নির্ধারণ বিষয়ে সীরাত গ্রন্থসমূহের মতপার্থক্য বর্ণনা শেষে বলেন, আশ্চর্যের ব্যাপার হল- তারা শয়নের স্থান পরিমাণ ঘরের একটি স্থানকে নির্ধারণ করে

২- মুআ'ল্লায় কিংবা অন্যত্র শাফায়াত চাওয়ার জন্য, অসীলা করা, কবরবাসীদের কাছে দু'আ চাওয়া অথবা কবরের পাশে আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য কবর যিয়ারত করা। কেননা এ কাজগুলো শিরক কিংবা শিরকের প্রতি পরিচালনাকারী মাধ্যম।

বলছেন যে, এটি রাসূল ﷺ-এর জন্মস্থান। শুদ্ধ কিংবা দুর্বল যে কোন পন্থায়ই এটা নির্ধারণ করা আমাদের কাছে সুদূর পরাহত। কেননা তার জন্ম মাক্কায় হয়েছে নাকি মাক্কার বাইরে সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এরপর তিনি বলেন, দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং খবরের সনদ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর ঘরের সে স্থানটিকে নির্ণয় করা সম্পূর্ণ দুরূহ। জন্মের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল জাহেলী যুগে তখন এমন কেউ ছিল না যিনি স্থান স্মরণ রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব দেবেন, বিশেষ করে যখন এর সাথে তাদের কোন উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট ছিল না। ইসলাম আগমনের পর সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অবস্থা থেকে এটা জানা যায় যে, তারা সে সকল স্থানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকে কোন গুরুত্ব দিতেন না, যেগুলোর সাথে শরীয়তের কোন আমলের সম্পর্ক ছিল না। কেননা অসি ও বাকযন্ত্রের মাধ্যমে শরীয়তের হেফাযত করার মত আরো গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো ছিল, তারা সে সবের প্রতিই যাবতীয় গুরুত্বারোপ করতেন। ইসলামের বহু ঐতিহাসিক চিহ্ন অস্পষ্ট থাকার কারণ ছিল এটাই।
আল-ইয়াশী যা উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে আবদুস সালাম আদ্-দিরঈ আল-মাগরিবি তার প্রসিদ্ধ দু'টো ভ্রমণ কাহিনীতে তার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন। দেখুন- তালখীস আল-মুআররিখ আল-আদীব হামাদ আল-জাসির রহ. পৃঃ ১৩৮।

আল-জাসিরও এ কথার প্রতি জোর দিয়ে বলেন, যে স্থানে রাসূল ﷺ জন্মস্থান করেছেন, সে স্থানের ব্যাপারে, মতভেদ এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, সাধারণ মানুষের কাছে জন্মস্থান নামে যে স্থানটি পরিচিত সেটি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। (মাজাল্লাতুল আরব ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭, সংখ্যা রামাযান ও শাওয়াল ১৪০২)

যদি ধরেও নেয়া হয় যে, রাসূল ﷺ-এর জন্মস্থানটি পরিচিত ও চিহ্নিত, তাহলেও এ কথা জানা দরকার যে, কোন অবস্থাতেই একে ইবাদাত করা ও বরকত চাওয়ার স্থান হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়, যেরূপ আজকাল অনেক জাহেল লোক এখানে সালাত আদায়, সেজদা করা বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে চুমু খাওয়া ও মাসেহ করার মত গর্হিত কাজগুলোর মাধ্যমে করে থাকে। কেননা রাসূল ﷺ এমনটি করেননি। তার কোন সাহাবা, তাবেয়ী এবং মান্যবর ইমামগণও তা করেননি। সালাফদের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সকল কল্যাণ এবং পরবর্তী যুগের লোকদের বিদআতের মধ্যেই রয়েছে সকল অকল্যাণ।

প্রজ্ঞাবান শরিয়ত প্রণেতা শর‘ঈ পন্থায় কবরসমূহ যিয়ারতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা হলো কবরস্থ ব্যক্তির জন্য দু‘আ করা, মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করা, উপদেশ গ্রহণ, পাষাণ হৃদয়কে কোমল করা, অশ্রুহীন চোখে অশ্রু প্রবাহিত করা।

৩- যে পানি দ্বারা কা‘বা ধৌত করা হয় সে পানি দ্বারা বরকত অর্জন এবং গোসল করা।

৪- কা‘বার গিলাফের কাপড় দ্বারা বরকত অর্জন করার জন্য উক্ত কাপড়ের অংশ সংগ্রহ করা এবং তা সংরক্ষণ করা ও তার অসিলা দিয়ে আরোগ্য চাওয়া। এছাড়া কিছু লোক গিলাফের কাপড় কেটে নিয়েও বাড়বাড়ি করে থাকে।

৫- মাকামে ইবরাহীম, কা‘বার গিলাফ, মসজিদুল হারামের দরজা ও পিলারসমূহ বরকত লাভের নিয়তে মাসেহ করা ও এগুলোকে চুমু খাওয়া।

৬- এ বিশ্বাস করা যে, যমযমের পানি অন্য দেশে নিয়ে গেলে তার স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়।

৭- কাবার যে কোন স্থানে চুমো দেয়া। এমনিভাবে মাকামে ইবরাহীম চুমো দেয়া বা মাসেহ করা। ইবনে জারির রহ. স্বীয় সনদ ও মুহাদ্দিস আজরকির সনদে কাতাদা রহ. এর বরাত দিয়ে কুরআনের আয়াত–

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴿١٢٥﴾﴾

এর ব্যাখ্যায় বলেন, (মাকামে ইব্রাহিমের নিকট নামাজ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, একে হাতে স্পর্শ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি...)[১৯০]

৮- বিদায়ি তাওয়াফের পর মসজিদুল হারামকে সামনে রেখে পিছন দিকে উল্টা হেঁটে বের হওয়া।[১৯১]

---

[১৯০] ইবনে জারির (৩/৩৫) হা. ২০০০। আজরকি (২/২৯) দ্র. তরতুশির ‘হাওয়াদেস অল বিদা’ পৃ:১০৩।

৯- এ বিশ্বাস রাখা যে, জুমু'আর দিন অকুফে আরাফা করতে পারলে তা বাহাত্তরটি হজের সমতুল্য হবে।[১৯২]

১০- তাওয়াফ এবং সা'ঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য দু'আ নির্দিষ্ট করা। তাওয়াফকারী শুরু করার সময়, মাকামে ইবরাহীমের কাছে ও যমযমের পানি পান প্রভৃতি কাজের সময় এমন বিশেষ দু'আ পাঠ করা যা নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি।

১১- এ বিশ্বাস রাখা যে, কা'বার দিকে শুধু তাকানোই একটি এবাদত। এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদিস নেই। ইবাদতের মূলনীতি হল- তা ওহি নির্ভর। সালাতের মধ্যেও কা'বার দিকে তাকানোর ব্যাপারে কেউ কেউ এ রকম ধারণা পোষণ করে। এ বিশ্বাস নবী (ﷺ) যে আমল করেছেন তার বিরোধী। কেননা তিনি যখন সালাত আদায় করতেন, তখন মস্তক অবনত রাখতেন এবং জমিনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন।[১৯৩]

১২- মিযাবের নীচে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া- **اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك** "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার ছায়ার নীচে সেদিন

---

[১৯১] দেখুন- আল-ইখতিয়ারাত আল-ইলমিয়াহ, ইবনে তাইমিয়াহ, পৃঃ ৭০। আযহারী বলেন, হাদীসের মধ্যে 'আল-কাহকারা' একাধিকবার এসেছে। এর অর্থ হল- যে দিকে সে হাঁটছে সে দিকে মুখ না ফিরিয়ে পিছন দিকে উল্টা হাঁটা। (তাহযীবুল্লুগাহ ৫/১২১)

[১৯২] দেখুন- মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা, আলবানী পৃঃ ৫৬।

[১৯৩] হাকিম মুস্তাদরাক গ্রন্থে (২/৩৯৩) আবূ হুরাইরাহ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তা হল- রাসূল ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তার দৃষ্টি আসমান অভিমুখে উঠাতেন। তখন নাযিল হল, الذين هم في صلاتهم خشعون "যারা সলাতে বিনয়াবনত থাকে"। এরপর তিনি মস্তক অবনত রাখতেন। হাদীসটি হাকিম শুদ্ধ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবীও তার সাথে একমত হয়েছেন– এ অধ্যায়ে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে, যা হাকিম ও বায়হাকী বুখারী ও মুসলিমে শর্তের ভিত্তিতে সহীহ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। (সালাতুন্নাবী ﷺ পৃঃ ৮০)

ছায়া প্রদান করুন, যেদিন আপনার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।[১৯৪]

১৩- কা'বা থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানি দ্বারা বরকত অর্জন।[১৯৫]

১৪- জনসাধারণ ও গণ্ড-মূর্খ লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, কা'বার অভ্যন্তরে যে প্রবেশ করবে তার জন্য খালি পায়ে জমিনে চলাফেরা করা জায়েয নয়, কা'বার ভেতর সে যা দেখেছে তা বর্ণনা ও কা'বার ছাদের দিকে তাকানো বৈধ নয়। যে কা'বার ছাদের দিকে তাকায় সে অবশ্যই অন্ধ হয়ে যাবে। এ ধরনের আরো যত ধারণামূলক কল্পনা ও কুসংস্কার রয়েছে- এগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন।[১৯৬]

অনেক হাজীর ধারণা যে, কাবায় প্রবেশ করা ওয়াজিব এবং তা হজের গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত। এটা অজ্ঞতা। এমনকি দেখা গেছে যে, কা'বার দরজা খোলার সময় ঢুকতে না পারার কারণে কোন কোন হাজী অত্যধিক দুশ্চিন্তায় কেঁদে ফেলার উপক্রম হয়েছিল।

এ ধরনের লোকেরা এসব এবাদত পালন ও আক্বীদা পোষণ করার কারণ হল- তাদের মধ্যে মিথ্যা ও দুর্বল হাদিসের প্রসার, যার উপর তারা নিজেদের কাজের সমর্থনে নির্ভর করে এবং দলিল দিয়ে থাকে।

কোন কোন বইয়ে উদ্ধৃত ও মুখে মুখে প্রচলিত এ সকল হাদিসের কিছু আমরা নীচে উল্লেখ করলাম, যেগুলো হাদিস বিশারদদের মতে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

১- ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এই ঘরে প্রত্যেক দিবস ও রজনিতে একশত বিশটি রহমত নাজিল করেন, যার ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি

---

১৯৪ মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল 'উমরা, আলবানী ৫২ পৃঃ।

১৯৫ প্রাগুক্ত।

১৯৬ আত্-তারিখুল কাবীম লিমাক্কাহ ওয়া বায়তুল্লাহ আল-কারীম, মুহাম্মাদ তাহির আল-কুরদী, ২/৫২২-৫২৩।

মুসল্লিদের জন্য, বিশটি বায়তুল্লাহর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীর জন্য।" এটি একটি দুর্বল হাদিস।[১৯৭]

২- যে ব্যক্তি মক্কার গরমে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামের গরম দূরীভূত করবেন। আবূ জাফর আল-উকাইলী বলেন, এটি ভিত্তিহীন।[১৯৮]

৩- 'মক্কার নির্বোধ ব্যক্তিরা হবে জান্নাতের অতিরিক্ত জনবল' এ হাদিসটির কোন ভিত্তি নেই। হাফেজ ইবনে হাজারকে এ হাদিস সম্পর্ক জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি এ হাদিস সম্পর্কে অবগত নই।[১৯৯]

৪- আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কা'বার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবাদত।[২০০]

৫- 'মক্কার নিদ্রিত ব্যক্তি অন্য জায়গায় সালাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তির সমতুল্য'। এটি সাধারণ কিছু লোকের মুখে প্রচলিত যার কোন ভিত্তি নেই।

৬- 'নূহের কিসতি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে দু'রাকাত'আত সালাত আদায় করেছিল'।[২০১]

৭- 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লায় প্রবেশ করল, সে একটি নেকির কাজে প্রবেশ করল এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে একটি পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেল'।[২০২]

---

[১৯৭] আলবানী এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। দেখুন- সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দায়ীফাহ ১/২২১-২২৩, দায়ীফ আল-জামে' হাদীস নং- ১৭৬০।

[১৯৮] আল-কাশফ আল-ইলাহী, মুহাম্মাদ আত-তরাবলূসী ২/৬৭৮।

[১৯৯] আল-আজওয়েবাহ আল-মুহিশাহ, পৃঃ ২৬৫; এছাড়া আরো দেখুন- মুখতাসারুল মাকাদেস আল-হাসানাহ, হাদীস নং- ৫৩১।

[২০০] আলবানী একে দুর্বল বলেছেন। দাঈফুল জামে' হাদীস নং- ৫৯৯০।

[২০১] ইবনুল জাওযী 'আল-মাওদু'আত' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন ১/১০০।

[২০২] এটি বায়হাকী সুনান গ্রন্থে (৫/১৮৫) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনুল যোআম্মিল এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি শক্তিশালী নন। ইমাম নাবাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-মাজমু ৮/২০৮।

ভিত্তিহীন এসব অশুদ্ধ হাদিসের মধ্যে একটি হল, ‘সপ্তাহান্তে সাত চক্কর তাওয়াফ করলে গুনাহ-খাতা মাফ হয়। সাত চক্কর সাতটি গুনাহ মাফ করে’। আরেকটি হল, ‘বৎসরান্তে ‘ওমরাহ পালন বৎসরের সকল পাপ মোচন করে’। আরেকটি হল, ‘যমযমের পানি বিধৌত কাফন, উক্ত কাফন পরিহিত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা করে’।

নবী (ﷺ)-এর উপর মিথ্যাচারের ভয়াবহতা এবং তা প্রসারের বিপদ ছাড়াও বেদআত ও বিভ্রান্তি প্রচলনে, শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত প্রকৃত তা’যীম ও সম্মান প্রদর্শনের অনুপস্থিতিতে ও পরিবর্তে ফাসেদ আক্বীদা এবং অর্থহীন প্রাণশূন্য প্রতীকী কিছু কাজ প্রচলনের পেছনে এ সকল হাদিস প্রচারিত হওয়ার বিরাট প্রভাব রয়েছে।

অতএব মুসলিমদের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যাকে সম্মানিত করেছেন তার প্রতি শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত বিশুদ্ধ পন্থায় সম্মান প্রদর্শন করা এবং আল্লাহ যাকে সম্মান দেয়ার নির্দেশ দেননি তাকে সম্মানিত করার মাধ্যমে কিংবা আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত কোন প্রমাণ ছাড়াই সম্মান প্রদর্শনের বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা থেকে সতর্ক থাকা।

কেননা রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ ও সুন্নাতের সুন্দর ও সঠিক অনুকরণ ছাড়া শুধুমাত্র ইখলাস ও নিয়তের সততার দাবি যথেষ্ট নয়।

শেষকথা : আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে হারাম শরীফের ফজিলত ও আহকাম বর্ণনা করেছি ও সম্মানিত স্থানসমূহের বিবরণ দিয়েছি। এখানে বিদ‘আত, পাপাচার ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া থেকেও সতর্ক করেছি। এরপর আমরা আহ্বান করছি আমাদের সেই সব মুসলিম ভাই-বোনদেরকে যারা এই হারাম নগরীতে ও বায়তুল্লাহ শরীফের আশেপাশে বসবাসরত এবং সেই হাজী উমরাহকারী ও জিয়ারতকারীদেরকেও যারা দূর-দূরান্ত হতে এখানে আগমন করে, যেন তারা সকলে শরিয়তের দলিলসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, আক্বীদা ও ফিকহের আহকাম শিখে নেন এবং হারাম নগরীর সাথে সংশ্লিষ্ট নবী (ﷺ)-এর দেয়া আদব-কায়দা মেনে চলেন। কেননা এটা হল আল্লাহর হারাম, তার ঘর এবং হারামের শহর। আল্লাহ এ শহরটিকে সম্মানিত করেছেন এবং অন্য সকল স্থান

হতে ইতিপূর্বে বর্ণিত সব আহকাম ফজিলত দিয়ে একে বিশেষত্ব দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতে সে-ই তাওফীক প্রাপ্ত, যে এ স্থানটির সঠিক মর্যাদা দিয়ে এর সম্মান ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। এখানে বেশি বেশি এবাদত পালনে ব্রত হয়েছে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকেছে। শরিয়ত অনুমোদিত সকল ফজিলতের কাজ করেছে এবং শরিয়তের নিষিদ্ধ সকল মন্দ কাজ ত্যাগ করেছে।

آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

গ্রন্থ পঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আন-নীসাবুরী : আল-এজমা’।

৩. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আযরুকী : আখবারু মক্কা।

৪. আল্লামা শায়খ আলাউদ্দীন আবুল হাসান আল-বাজলী : আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিক্‌হিইয়্যাহ, দারুল বায, মক্কা।

৫. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি : আল-আদাবুল মুফরাদ।

৬. আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী আল-ইসাবাহ ফি তামঈযিস সাহাবা।

৭. মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস আল-শাফেয়ি : আল-উম্‌ম

৮. আবূ বকর ইবনুল মুনযির আন-নীসাবুরী : আল-আওসাত ফিস্ সুনান ওয়াল এজমা’ ওয়াল ইখতিলাফ।

৯. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে ‘উমার ইবনে কাসীর : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

১০. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমা‘ঈল আল-বুখারি : আত-তারিখ আস-সাগীর।

১১. মুহাম্মাদ তাহের কুরদী : আত-তারীখুল কারীম লিমাক্বাতা ওয়া বায়তুল্লা হিল-কারীম।

১২. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমা'ঈল আল-বুখারি।
১৩. আবূ 'উমার ইউসুফ ইবনে 'আবদিল বার : আত-তামহীদ লিমা ফিল মুআত্তা মিনাল মাআ'নী ওয়াল আসানিদ।
১৪. মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী : জামি'উল বায়ান আ'ন তা'বিল আইল কুরআন (তাফসীরে তবারী)
১৫. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-কুরতুবী : আল-জামে' লেআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী)।
১৬. আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবনে 'উমার ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনুল কারীম (তাফসীরু ইবনে কাসীর)
১৭. আহমাদ ইবনে শোআ'ইব আন-নাসায়ী : তাফসীর আন-নাসায়ী।
১৮. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শারাফুদ্দীন আন-নাবাবী : তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত।
১৯. শাইখ আবদুর রহমান ইবনে সা'দী : তাইসীরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীরি কালামির রহমান।
২০. আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে রজব আল-হাম্বালী : জামি'উল উলুম ওয়াল হিকাম।
২১. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনেল ওয়ালীদ আত-তারতুশী। তাহকীক : বাশীর 'উয়ুন, আল-হাওয়াদিস ওয়াল বিদা', মাকতাবাতুল মুয়ায়্যিদ, ২য় সংস্করণ।
২২. ইমাম আবূ বকর আহমাদ ইবনেল হুসাইন আল-বায়হাকী : দালায়িলুন নুবুওয়াহ।
২৩. ইবনেল কাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ : যাদুল মাআ'দ।
২৪. হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল-কাযবীনী : সুনান ইবনে মাজাহ।
২৫. আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে 'ঈসা আত্-তিরমিযী : আল-জামি' আস-সহীহ (সুন্নান তিরমিযী)।

২৬. আবূ বকর আহমাদ ইবনেল হুসাইন আল-বায়হাকী : আস-সুনান আল-কুবরা।

২৭. আহমাদ ইবনে শু'য়াইব আন-নাসায়ী : আস-সুনান আল-কুবরা।

২৮. মুহাম্মাদ ইবনে নাসিরউদ্দীন আল-আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ।

২৯. মুহাম্মাদ ইবনে নাসিরউদ্দীন আল-আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দায়ী'ফাহ।

৩০. ইবনে হিশাম : আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ।

৩১. হুসাইন ইবনে মাস'উদ আল-বাগাবী : শারহুস সুন্নাহ।

৩২. আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ আন-নাবাবী : শারহু মুসলিম।

৩৩. আবূ জা'ফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ আত-তহাবী : শারহু মাআ'নিল আসার।

৩৪. মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ ইবনে উসাইমীন : আশ-শারহুল মুমতি' 'আ'লা যাদিল মুস্তাকনি'।

৩৫. আল ফাসী মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আবুত তাইয়িব তাকিউদ্দীন : শিফাউল গারাম, মাকতাবাতুল নাহদাতিল হাদীসাহ ওয়া 'ঈসা আল-বাবী।

৩৬. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারি : সহীহ আল-বুখারি (আল-জামে' আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি)।

৩৭. আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান আল-বাস্তি : সহীহ ইবনে হিব্বান।

৩৮. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাহ : সহীহ ইবনে খুযাইমাহ।

৩৯. মুহাম্মাদ ইবনে নাসিরউদ্দীন আল-আলবানী : সহীহ সুনানি ইবনে মাজাহ।

৪০. মুহাম্মাদ ইবনে নাসিরউদ্দীন আল-আলবানী : সহীহ আল-জামি‘ আস-সগীর ওয়া-যিয়াদাতিহী।

৪১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনেল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী : সহীহ মুসলিম।

৪২. মুহাম্মাদ ইবনে নাসিরউদ্দীন আল-আলবানী : সিফাতু সালাতিল নবীইয়ি (ﷺ) মিনাত তাকবীরি ইলাত তাসলীম। আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৯১ হিঃ।

৪৩. মুহাম্মাদ ইবনে নাসিরউদ্দীন আল-আলবানী : দায়ী’ফ আল-জামি‘ আস্-সাগীর ওয়া যিয়াদাতিহী।

৪৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ আল-আ’ইনী উমদাতুল কারী শরহু সহীহ আল-বুখারি।

৪৫. ইবনে কুতাইবা আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম আবুল ওয়ালীদ : গারীবুল হাদিস।

৪৬. ইবনে হাজার, আহমাদ ইবনে আলী আল-আসকালানী : ফাতহুল বারী।

৪৭. মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আত-তারাবলূসী : আল-কাশফুল ইলাহী আ’ন শাদীদিদ দা‘ফি ওয়াল মাওদুয়ী ওয়াল ওয়াহী।

৪৮. আবুল ফদল জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম ইবনে মানযূরঃ লিসানুল আ‘রব।

৪৯. ‘আলী ইবনে আবূ বকর আল-হাইসামী : মাজমূ‘উ আয-যাওয়াইদ।

৫০. মাজমু’ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, সংকলন- আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম।

৫১. আবদুল আযীয ইবনে বায : মাজমু’ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওইয়া।

৫২. আবূ মূসা আল-আসফাহানী : আল-মাজমু’ আল-মুগীস ফি গারীবাই আল-কুরআন ওয়াল হাদিস।

৫৩. আবূ মুহাম্মাদ ‘আলী ইবনে আহমাদ ইবনে হাযম আয-যাহিরী : আল-মুহাল্লা।

৫৪. ইমাম আয-যারকানী : মুখতাসারুল মাকাসিদ আল-হাসানাহ, তাহকীক : ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ।

৫৫. আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাকিম : আন-নীসাবুরী : আল-মুসতাদরিক আ'লাস সাহীহাইন।

৫৬. আবূ আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল আশ-শাইবানী : মুসনাদুল ইমাম আহমাদ।

৫৭. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনে দাউদ আত-তায়ালিসি : মুসনাদুত তয়িলিসী।

৫৮. আত-তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ।

৫৯. আল-বুসিরী : মিসবাহুয যুজাজাহ ফি যাওয়াইদি ইবনে মাজাহ।

৬০. আবূ বকর আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম আস-সানাআ'নী : আল-মুসান্নাফ।

৬১. আল-বিলাদী : মাআ'লিম মক্কা আত-তারিখিইয়্যাহ।

৬২. আবূ আবদুল্লাহ ইয়াকুত ইবনে আবদুল্লাহ আল-হামূদী : মু'জাম আল-বুলদান।

৬৩. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে কুদামাহ আল-মাকদিসী : আল-মুগনী।

৬৪. মুহাম্মাদ ইবনে নাসিরউদ্দীন আল-আলবানী : মানাসিক আল-হজ ওয়াল উমরাহ।

৬৫. আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আ'লী ইবনেল জাওযী : আল-মাওদু‘আত।

৬৬. আবূ আবদুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস : আল-মুয়াত্তা।

৬৭. আবুস সা'আদাত আল-মুবারক ইবনে মুহাম্মাদ আল-জাযারী (জাগরী আসীর) : আন-নিহায়া ফি গারীবিল হাদিস ওয়াল আসার।

৬৮. আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আ'লী ইবনেল জাওযী : আল-ওয়াফা।